অরুণা

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স
৯০।২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

প্রকাশক

শ্রীসুধীর চন্দ্র সরকার

৯০।২এ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—১ বৈশাখ, ১৩৪৯

ফিনিক্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস

এস, সি, চৌধুরী কর্ত্তৃক মুদ্রিত

২৯নং কালিদাস সিংহের লেন. কলিকাতা।

বন্ধুবর—

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের

করকমলে

———

অরুণা

অশোক ছিল গরীবের ছেলে আর অরুণা ছিল এক গরীবের মেয়ে। অশোকের গুণ ছিল; সে বিদ্বান, অধ্যবসায়ী ও সচ্চরিত্র। অরুণারও গুণ ছিল; সে ধৈর্য্যশীলা, মিতভাষিণী। আর ছিল তার রূপ, দেবতারও কাম্য সেই রূপ। এই অরুণা ছিল অশোকের বাক্‌দত্তা।

অশোকের পিতা অন্নদাচরণ ছিলেন দরিদ্র। কলিকাতা শহরে এক পল্লীর মধ্যে তাঁর পৈত্রিক একখানা বাড়ী ছিল। সংস্কারের অভাবে বাড়ীর অবস্থা বাড়ীর মালিকের চেয়েও জীর্ণ হোয়ে পড়েছিল। এই বাড়ীরই কোথাও একটু বিলিতী মাটি লেপে, কোনো ঘরের ছাতের তলায় গরাণের চাড়া দিয়ে তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে একটি-মাত্র ছেলে নিয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করছিলেন, এমন সময় তালকানা বিধাতা ফাঁকের ঘরে তেহাই মেরে তাঁর জীবন-সঙ্গত শেষ কোরে দিলেন।

অশোকের বাবা যখন মারা গেলেন তখন তার বয়স মাত্র আঠার। সবেমাত্র এণ্ট্রেন্স পাশ কোরে সে কলেজে ভর্ত্তি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে কুড়ি টাকা জলপানি পেয়েছিল,

সেই টাকায় তার কলেজের খরচ তো চল্‌ছিলই, তা ছাড়া সংস্কারেরও সাহায্য হচ্ছিল।

অন্নদাচরণ মনে করলেন, ছেলেটা এবার মানুষ হোতে চল্‌ল, এবার স্থখের মুখ দেখে মর্‌ব। পাড়ার লোকে বল্লে—অশোক ছোঁড়াটা মানুষ হবে—।

অশোকের চোখের সাম্‌নে তখন রঙিন ছুনিয়া, কল্পনার মহাসাগর। এই সাগরের তীরে বসে জীবনটাকে সে যত উঁচুতে পারে, উঠিয়ে দিচ্ছিল। কখনো হাইকোর্টের জজ, কখনো বা বরোদা রাজ্যের মন্ত্রী—কোথাও বাধা নাই। যদি কিছু বাধা আসে তার শক্তির কাছে সে বাধা কতক্ষণ টেঁক্‌বে? মহা উৎসাহে সে কলেজে যাচ্ছিল, নতুন বন্ধুদের সঙ্গে হাসি, গল্প পড়াশুনায় দিন কাটাচ্ছিল, এমন সময় পিতার মৃত্যু!

পিতার মৃত্যুর জন্য বেচারা অশোক মোটেই প্রস্তুত ছিল না। সে ভেবে রেখেছিল বি-এ, এম-এ পাশ কোরে যখন অনেক টাকা রোজগার করবে, তখন বাবা ও মাকে কাশী পাঠিয়ে দেবে, তাঁরা নিশ্চিন্ত মনে স্থখে থাকবেন। কিন্তু অকস্মাৎ এই দুর্ঘটনা ঘটে গেল। জীবনে এই সে প্রথম দুঃখ পেলে।

পাড়ার লোকেরা নানাজনে নানারকম বোঝাতে লাগ্‌লেন। কেউ বল্লেন—আর কেন, পড়াশুনো ছেড়ে এবার কাজকর্ম্মের চেষ্টা দেখ। কেউ বা বল্লেন—এফ-এ টা পাশ কোরে মেডিকেল কলেজে ঢুকে যাও।

পাড়ার অনেকেই অশোকের মাকে বল্লেন—এইবার কাল্লাশৌচ

পেরুলে ছেলের বিয়ে দিয়ে সংসারী কোরে দাও। কর্ত্তা চলে গেলেন তুমি কবে আছ না আছ, তোমরা যাবার আগে ওকে যদি স্থিতি না কোরে যাও তবে ছেলেটা ভেসে যাবে।

অশোক ও অশোকের মা কারুব কথায় কোনো জবাব দিতে পাবলে না। দুজনেই ঘাড় হেঁট কোবে তাদের উপদেশ শুনে গেল।

অন্নদাচরণেব জীবনযাত্রাই কষ্টে চল্‌ত। জীবন অবসানের পবেও যে বাস্তাটুকু চল্‌তে হবে তাব জন্য কোনো পাথেয় তিনি সঞ্চয় কোরে রেখে যেতে পারেন-নি। শ্রাদ্ধের দিন ঘনিয়ে আসায় অশোক তাব মাকে জিজ্ঞাসা কবলে—মা, ঘরে কিছু আছে নাকি ?

অশোকের মা বল্লেন—পঁচিশটে টাকা আছে বাবা।

অশোক মার কাছে বসে হিসাব কোবে দেখ্‌লে পঁচিশ টাকায় হবে না। সে মাকে বল্লে—আচ্ছা ও টাকা তুমি বেখে দাও, আমি দেখ্‌চি।

অশোক তাব এক কলেজের বন্ধুব কাছ থেকে একশ' টাকা ধার কোরে এনে জনকয়েক মাতব্বরকে ডেকে পিতার শ্রাদ্ধ শান্তি করলে। শ্রাদ্ধের গোল মিটে যাওয়ার পর একদিন সে মাকে বল্লে—মা কি করব বল, লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে কাজকর্ম্মের চেষ্টা দেখ্‌ব ?

অশোকের মা বল্লে—তাই দেখ বাবা, ওবা যখন বল্‌চে তখন আর কাজ নেই পড়াশুনো কোরে।

অশোক বল্লে—কিন্তু কাজকর্ম্ম খুঁজে নেওয়া বড় সহজ ব্যাপার নয়। যা বাজার পড়েছে তাতে পেছনে একটা লেজুড় না থাক্‌লে কিছুই হবার উপায় নেই।

কাজকর্ম্ম পাওয়া সম্বন্ধে অশোক কিংবা তার মার প্রত্যক্ষ কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। তবে জ্ঞান হওয়া থেকেই এই কথা সে শুনে আস্‌চে, আর অশোকের মা-ও স্বামীর কাছে এই কথা সমস্ত জীবন ধরেই শুনেচেন। কথাটা যে ধ্রুব সত্য সে বিষয়ে তাঁর কোনো সন্দেহই ছিল না।

যোগমায়া ছিলেন নির্ব্বিরোধী ভালো মানুষ। ছেলের কথার কোনো জবাব না দিয়ে তিনি চুপ কোরে রইলেন।

অশোক বল্লে—মা, আমরা তো সংসারে দুটী প্রাণী। আমি কুড়ি টাকা জলপানি পাই, তা থেকে চার টাকা কলেজের মাইনে যায়। আর আমি ছেলে পড়িয়েও কিছু রোজগার করব। তাতে আমাদের সংসার বেশ চলে যাবে, তুমি কিছু ভেব না মা।

যোগমায়া বল্লেন—বেশ বাবা তাই কর।

পড়াশুনা বন্ধ না কোরে অশোক নিয়মিত কলেজে যেতে লাগ্‌ল। কিছুদিন চেষ্টা কোরে সে ছেলে পড়াবার কাজও একটা জুটিয়ে নিলে। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সে বুঝ্‌তে পারলে যে, সংসারটাকে সে যতটা মোলায়েম মনে করেছিল বাস্তবপক্ষে সে ততটা মোলায়েম নয়। অল্পদিনের মধ্যেই দারিদ্র্যের কঙ্কালমূর্ত্তি ধীরে-ধীরে তার চোখের সম্মুখে স্পষ্ট হোয়ে ফুটে উঠ্‌তে আরম্ভ করলে। সে দেখ্‌লে, এই বীভৎস পৃথিবীটাকে

তাব পিতা নিজের স্নেহময় মূর্ত্তি দিয়ে কেমন কোরে ঢেকে বেখেছিলেন! এমন হীন স্বার্থপরতা ও নিষ্ঠুরতা এতদিন তার কাছে কেমন কোরে আত্মগোপন কোরে ছিল! প্রতি পদে শঠতা ও মিথ্যাচার, এ না করলে উপায় নাই।

অশোক বুদ্ধিমান ছেলে। সে দুদিনেই দুনিয়াকে চিনে ফেল্লে। এরই মাঝে নিজেকে বাঁচিয়ে সে উন্নতির পথ কোরে চল্‌তে লাগ্‌ল। দারিদ্র্য রাক্ষসী কতবার তার আশার প্রদীপ নিভিয়ে দেবাব চেষ্টা কবেছে। কতবাব তার মনে হযেছে—আর পারি না, এইবাব পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে যা হোক্ একটা চাকৃরী-বাকৃরীতে ঢুকে যাই। তা হোলে আর যাই হোক্ পরীক্ষার ফি, শীতের সময় মার একখানা গায়ের কাপড়, ভাঙা বাড়ীর টেক্স, এর জন্য ভাবতে হবে না। কল্পনায় ভবিষ্যৎ জীবনকে যে রঙিন-স্বপ্নে সে রাঙিয়ে তুল্‌ত, বর্ত্তমানের কষ্টে সে স্বপ্নকে তার স্বপ্ন বলেই ভ্রম হোতো। রাত্রে শুয়ে কতবার সে সঙ্কল্প করেছে, কাল থেকে কলেজে যাওয়া বন্ধ কোবে দিয়ে কাজকর্ম্মের চেষ্টা সুরু করতে হবে। নবীন প্রভাত আবার তাকে নূতন জীবন দান করেছে, নবীন উৎসাহে আবার সে জীবনযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছে।

অশোক এফ-এ পরীক্ষা ভালো কোরে পাশ কর্‌লে বটে, কিন্তু সে জলপানি পেলে না। তখন সামনেই বি এ পরীক্ষা, শীগ্‌গীরই পরীক্ষার ফি জমা দিতে হবে, কিন্তু অশোক কয়েক-দিন ধরে প্রাণান্ত চেষ্টা কোরেও টাকার যোগাড় কর্‌তে

পাব্‌ছিল না। সেদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ঘুরে-ঘুরে কোথাও টাকা না পেয়ে তার মনটা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হযেছিল, তার খালি মনে হচ্ছিল এবার বুঝি তীবে এসে তরী ডুব্‌ল। নিজের ঘরটাতে বসে সে আকাশ-পাতাল ভাব্‌চে এমন সময় তাব মা খেতে ডাকলেন। খেতে বসে একথা-সেকথার পব যোগমায়া বল্লেন—এবার বিয়েটা কোরে ফেল্‌। অরুণাও বড় হয়েছে, তার মা তো আব তাকে রাখতে পাব্‌চে না। গরীব বিধবা সে, পাড়ার লোকে ভারি নিন্দে কব্‌চে।

মার কথাব কোনো জবাব না দিয়ে অশোক টপ্‌ কোবে পাশ থেকে জলের গেলাসটা তুলে নিয়ে চোঁ-চোঁ কোরে খানিকটা জল খেয়ে আবার খাবাবের দিকে মনোনিবেশ করলে।

উত্তবের প্রতীক্ষায় যোগমায়া কিছুক্ষণ ছেলের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন, কিন্তু কোনো জবাব না পেয়ে আবার তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কি রে বল্‌না, চুপ কোবে রইলি যে!

অতি দুঃখে অশোকের হাসি পেল, সে এবাবেও কিছু বল্লে না।

ছেলেকে চুপ কোরে থাক্‌তে দেখে যোগমায়া উৎসাহিত হোয়ে বল্লেন—তা হোলে কালই অরুণাব মাকে ডেকে পাঠাই, আস্‌চে আষাঢ়েই যাতে বিয়েটা হয় তার বন্দোবস্ত করতে বলি?

অরুণার সঙ্গে অশোকের বিয়ে হবে এটা ঠিক থাক্‌লেও অশোক স্থির কোরে রেখেছিল যে, লেখাপড়া শেষ না কোরে সে বিয়ে করবে না। অরুণাকে সে ভালবাস্‌ত। তার সংসারে

যে দারিদ্র্য, অরুণাকে তার ভাগীদার করবার চিন্তাতেই তার মন সঙ্কুচিত হোযে যেত। দারিদ্র্য যে প্রেমের সমস্ত মাধুর্য্য নষ্ট করে এ সে সর্ব্বত্রই দেখেছে। এই ভেবেই সে স্থির করেছিল যে, সে দুঃখ সে অরুণাকে কিছুতেই দেবে না। বিয়ের পরে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এতখানি চিন্তা করা অশোকের বয়সী যুবকের পক্ষে একটু অস্বাভাবিক হোলেও অশোক সে কথা ভেবেছিল, আর ভাব্‌বার কারণও তার যথেষ্ট ছিল। আজ এই দুঃসময়ে মার মুখে বিয়ের প্রস্তাব শুনে সে কোনো জবাবই দিতে পারলে না।

অশোকের কোনো জবাব না পেয়ে যোগমায়া বলে যেতে লাগ্‌লেন—আর বন্দোবস্তই বা করবে কি! আমি তো বলেছি শুধু শাঁখা সিঁদুর পরিয়ে বউ নিয়ে আস্‌ব।

তিনি অরুণাদের দারিদ্র্য সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলে যেতে লাগ্‌লেন, কিন্তু সে সব কথা অশোকের কানেও গেল না। তাঁর কথার মাঝখানেই অশোক একবার বল্লে—মা, বিয়ের কথা এখন থাক্।

অশোকের মা বল্লেন—কেন রে? পড়াশুনোর অসুবিধে হবে? না হয় বৌ এখন তার মার কাছেই থাক্‌বে। এত দিন আছে আরো দুটো বছর না হয় রইল। কিন্তু বিয়েটা এখন কোরে ফেল বাবা, না হোলে ওদের ভারী নিন্দে হচ্ছে। আহা! গরীব বেচারা!

অশোক হেসে বল্লে—আমরাই বা এমন কি বড়লোক মা?

—তা হোক্! আমার ছেলে, আর তার মেয়ে। ছেলেতে মেয়েতে অনেক তফাৎ।

অশোক মার কথা শুনে একটু চুপ করলে। তারপরে বল্লে—অরুণারা গরীব, আমাদের চেয়েও গরীব। বাবা গরীব ছিলেন, সারাটা জীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে-করতেই তাঁর কেটে গেল। জীবনে সুখের মুখ একদিনও তিনি দেখতে পেলেন না। বাবা মারা যাবার সময় একটি পয়সাও রেখে যেতে পারলেন না। তাঁর মৃত্যুর পর থেকে আজ পর্য্যন্ত কি কষ্টে পড়াশুনোর খরচ চালাচ্ছি সবই তো তুমি জান মা। ভগবান না করুন, কিন্তু ধর, অরুণাকে বিয়ে কোরে দুটি নাবালক ছেলে রেখে আমি যদি মরে যাই তা হোলে কি হবে একবার ভাব তো? আমি যে কষ্ট ভোগ করচি সে কষ্ট আমি আমার স্ত্রী ও ছেলে-মেয়েদের দিতে পারব না। তার চেয়ে বরং আমি বিয়েই করব না।

পুত্রের মৃত্যুর কথা শুনে যোগমায়ার বুকটা ধড়াস্ কোরে উঠল। সেই সঙ্গে তাঁর অনেক কথাই মনে পড়ল। মনে পড়ল, সংসারের অনাটনের কথা, তাঁর স্বামীর কথা। স্বামীর মৃত্যুর পর অশোক যে কি কোরে খরচ জোগাড় করচে সে কথা—তাঁর চোখ দুটো জলে ভরে এল। তিনি কোনো উত্তর দিতে পারলেন না।

কিছুক্ষণ পরে অশোক বল্লে—অরুণা তো দেখতে খারাপ নয়, তাকে বিয়ে করবার লোকের অভাব হবে না।

যোগমায়া বল্লেন—সে কি কোরে হবে! তারা এতকাল আমাদের মুখ চেয়ে বসে রইল, আজ আমি কি কোরে সে কথা তাদের বল্‌ব।

অশোক বল্লে—তবে তাদের আর কিছুদিন সবুর করতে বল মা। আমি অরুণাকে বিয়ে কর্‌ব, তার বয়স বাড়্‌ল কিনা তা নিয়ে পাড়ার লোকে যেন মাথা না ঘামায়।

মায়ে ছেলেতে সেদিন আর কোনো কথা হোলো না। অশোক আসন ছেড়ে মুখ ধুয়ে বাইরের ঘরে পড়্‌তে গেল।

দীননাথ ঘোষাল আর অন্নদাচরণ মুখুয্যে একই পল্লীর বাসিন্দা। পাশাপাশি তাঁদের বাড়ী। দীননাথ দীন দরিদ্র, অন্নদাও তাই। এদের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। দীননাথের এক মেয়ে অরুণা আব অন্নদার এক ছেলে অশোক।

এই দুটি পরিবারের মধ্যে খুব সম্প্রীতি থাকায় অশোক ও অরুণা প্রায় একসঙ্গেই মানুষ হচ্ছিল। এদের দুজনের ভাব দেখে অন্নদা একদিন বন্ধুব কাছে প্রস্তাব করেছিলেন—তুমি অরুণার অন্য কোথাও সম্বন্ধ দেখো না, অশোকের সঙ্গে আমি ওর বিয়ে দেব।

অরুণার বয়স তখন ছয় সাত বৎসর আর অশোকের বয়স তখন বাবো। কন্যাব বিবাহের বয়স না হোলেও এ জন্মে একবার দারিদ্র্যকে ফাঁকি দিতে পেরেছেন মনে কোরে দীননাথ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। সেই থেকে দুই পরিবারেব মধ্যে আত্মীয়তা বেড়েই চলল। অশোকের মা দীননাথকে দেবর সম্পর্কে ডাকতেন, কিন্তু সেই থেকে তিনি তাঁদের বেয়াই হোয়ে দাঁড়ালেন। অরুণা যোগমায়াকে ডাকত বড়-মা বলে, আর অরুণার মা অশোককে জামাই বলে ডাকতেন।

অশোক ও অরুণার মধ্যে এই যে নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হোলো তার সংবাদ তারা দুজনেই পেয়েছিল। তারপর অশোক ও অরুণা দুজনেই বড় হোতে লাগল, অশোক অরুণাকে ভালবাসতে আরম্ভ করলে। আঠার বছরের ছেলে তেরো বছরের কিশোরীকে

যতখানি ভালবাসতে পারে। তিন দিনের জ্বরে অরুণার বাবা যখন হঠাৎ মারা গেলেন তখন অরুণার মা কাঁদতে-কাঁদতে যোগমায়াকে বলেছিলেন—দিদি, আমার অরুণার কি হবে?

অন্নদা ও যোগমায়া দুজনেই তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন—যে গিয়েছে সে তো আর ফিরবে না, তোমার অরুণার ভার তো আমরা নিয়েছি। আমাদের অশোক বেঁচে থাক্, তোমাদের কোনো ভাবনা নেই।

সদ্য পিতৃহীনা অরুণাকে অন্নদা নিজের বাড়ীতে রেখে যখন বন্ধুর সৎকার করতে গেলেন তখন অশোক তাকে কত সান্ত্বনা দিয়েছিল সে কথা একমাত্র অরুণাই জানে। তারপরে দুজনেরই অজ্ঞাতসারে এই দুটি জীবন পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছিল, এমন সময় অকস্মাৎ অশোকের পিতার মৃত্যু!

অশোকের সেই কঠোর জীবনযাত্রার পথে মাঝে-মাঝে অরুণার মুখখানা যে উঁকি দিত না, এমন নয়। কখনো-কখনো অরুণাকে একলা পেলে সে তার সঙ্গে পরামর্শ করত। সংসারজ্ঞান-অনভিজ্ঞা অরুণা অশোকের সব কথাতেই সায় দিত, অশোক তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের যে উজ্জ্বল ছবি তার চোখের ওপর ধরত, তারই সুখে বিভোর হোয়ে অরুণা দিন কাটাত। এমন সময় অশোক একদিন মার মুখে শুনলে যে, অরুণার বয়স বেড়ে যাচ্ছে শীগ্‌গীরই তার বিয়ে হওয়া চাই।

অরুণার মা জানতেন যে, সংসারে তাঁদের আত্মীয় স্বজন কেউ নেই। তাঁর স্বামীর এক ধনী মামাতো ভাই ছিল, কিন্তু পাছে কিছু

সাহায্য করতে হয় এই ভয়ে কখনো তিনি অরুণাদের খোঁজ খবর পর্য্যন্ত নিতেন না। অরুণার মা বাড়ীর তিনখানি ঘর ভাড়া দিয়ে সেই অর্থে সংসারের খরচ চালাতেন, হাজার কষ্টেও তিনি তাঁর এই ধনী দেবরের কাছে সাহায্য ভিক্ষা করেন-নি।

অরুণার বয়স বেশী হয়েছিল সে কথা তার মা যে বুঝতে পারতেন না তা নয়। তাঁদের ঘরে সতেরো বছরের মেয়ে সাধারণতঃ অবিবাহিতা থাকে না। তবে তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, অশোক একটু গুছিয়ে নিতে পারলেই বিয়েটা হয়ে যাবে। এমন সময় তাঁর ধনী দেওর একদিন এসে বল্লেন—অরুণার বিয়ে না দিলে তাঁর আর মান ইজ্জত থাকে না।

অরুণার মা হরিপ্রিয়া ধনী দেওরের এই আকস্মিক আবির্ভাবে আশ্চর্য্য হোয়ে গেলেন। তার চেয়েও বেশী আশ্চর্য্য হলেন তাঁর কথা শুনে। তিনি তাঁর দেওরটিকে মিষ্টিকথায় শুনিয়ে দিলেন—ভাইঝির বয়স বাড়্‌চে সে কথা কি আজ মনে পড়্‌ল? তার বিয়ের জন্য তোমাদের ভাব্‌তে হবে না, বয়স বাড়ার জন্য অরুণার বিয়ে আট্‌কাবে না।

ধনী দেওর বল্লেন—অরুণার না আট্‌কালেও আমার মেয়ের যে বিয়ে আট্‌কে যাচ্ছে।

ধনী দেওর হরিপ্রিয়াকে বুঝিয়ে দিলেন যে, অরুণার অত বয়স অবধি বিয়ে না হওয়ায় তাঁর মেয়ের জন্য ভাল পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়ী যাবার সময় তিনি বৌদিকে বুঝিয়ে গেলেন-সোনার সিংহাসনের আশায় বসে থেকো না বৌদি। অশোক যদি অরুণাকে

বিয়ে করতে চায় তো এই বেলা কোরে ফেলুক না? শুনেছি সে লেখাপড়ায় ভাল। দুদিন বাদে যদি কোনো বড়লোক দশটি হাজার টাকা ওকে দিতে চায় তা হোলে কি তুমি মনে করেচ ও তোমার মেয়েকে বিয়ে করবে? তখন একূল-ওকূল দুকূলই হারাতে হবে। আমার হাতে পাত্র আছে, পাত্রটীর বয়স একটু বেশী হোলেও সে সচ্চরিত্র, আর তোমার মেয়ের তো বয়স কম নয়। ভালো কোরে বুঝে দেখ।

সেই দিনই সন্ধ্যার সময় হরিপ্রিয়া যোগমায়ার কাছে গিয়ে সব কথা খুলে বলে জিজ্ঞাসা করলে—কি করব?

যোগমায়া অশোকের কাছে কথাটা পাড়্লেন। অশোকের মাথায় তখন চক্কর ঘুর্‌ছে। সমস্ত দিন কোথায় টাকা, কোথায় টাকা কোরে ঘুরে বিয়েব প্রস্তাবে তেমন মাথা দেবার অবসর তার নাই। যোগমায়া তিন চার দিন অশোকের কাছে কথা পাড়্লেন, এই নিয়ে মায়ে-ছেলেতে তর্ক, অভিমান শেষে একদিন ঝগড়া পর্য্যন্ত হোয়ে গেল। কিন্তু অশোকের সংকল্প স্থির, লেখাপড়া শেষ না কোরে সে বিয়ে কর্‌বে না। অরুণাকে এনে আমি কষ্ট দেব না, তার চেয়ে সে যদি অন্য কারুকে বিয়ে কোরে সুখী হয় তো হোক্।

অরুণার সঙ্গে এ সম্বন্ধে একটা শেষ কথা কইবার জন্য অশোক দিন কয়েক চেষ্টা করলে, কিন্তু অরুণার ধনী খুড়ো শুধু ধনীই ছিলেন না, সাংসারিক জ্ঞানও তার বিলক্ষণ ছিল। তিনি এই

সময় দিন-কয়েকের জন্য অরুণাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বাধায় সে সুবিধাও হোলো না।

একদিন যোগমায়া অত্যন্ত সঙ্কুচিত চিত্তে অরুণার মাকে ছেলের মনের কথা জানিয়ে এলেন। হরিপ্রিয়া এতদিন পরে মেয়ের ভাবী শাশুড়ীর মুখে এই কথা শুনে চোখে অন্ধকার দেখলেন। দরিদ্রা, অসহায়া বিধবা যে এতদিন তাঁদের মুখ চেয়েই বসে ছিলেন। যোগমায়া তাকে আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—বোন্, আমি বল্‌চি, আমার আশীর্ব্বাদে তোমাব মেয়ের ভালো বর হবে।

অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে হরিপ্রিয়া বল্লেন—তোমরাই আশা দিয়েছিলে দিদি—তা না হোলে কানা খোঁড়া যাই হোক্ কর্ত্তাই ওর বিয়ে দিয়ে যেতেন।

অশোকের মা এ কথার আব কি উত্তর দেবেন! তিনি আর কোনো কথা না বলে নিজের বাড়ীতে ফিরে এলেন। সেদিন মাযেতে-ছেলেতে কোনো কথাই হোলো না।

অশোক অরুণাকে অবহেলা করলেও তার পাত্রের অভাব হোলো না। হরিপ্রিয়া দেখলেন যে, তাঁর ধনী দেওরের কথাই ঠিক। এখন বিয়ে করা আর দু' বছর বাদে বিয়ে করার মধ্যে কোনো পার্থক্য তিনিও বুঝতে পারলেন না। সেই বছরেই আষাঢ় মাসে কাশী থেকে পাত্র এসে অরুণাকে আদরে তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী কোরে নিয়ে চলে গেল। ধনী দেওর মুরুব্বী হোয়ে বিধবা হরিপ্রিয়াকে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার করলেন।

অরুণার বিয়েতে অশোক্ নিমন্ত্রিত হয়েছিল, কিন্তু সে সেখানে

যেতে পারলে না। একলা বাড়ীতে বসে-বসে নিজের ক্ষত-বিক্ষত অপরাধী মনকে সমস্ত দিন ধরে সে সান্ত্বনা দিতে লাগ্‌ল। বিয়ের পর দিন সজল সন্ধ্যায় সে তাদের ছেলে-পড়া বৈঠকখানার ভাঙা জানালার ধারে বসে দেখ্‌লে—অরুণা কাঁদতে-কাঁদতে তার বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে গাড়ীতে গিয়ে উঠ্‌ল। তার পরে গাড়ী ষ্টেশনের দিকে চলে যেতেই অশোক কোন্ থেকে ছাতাটা তুলে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। সেই বৃষ্টিতে পথে-পথে ঘুরে বেড়িয়ে অনেক রাতে বাড়ী ফিরে অশোক দেখ্‌লে তার মা নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছেন। এই দুটো দিন তিনি অরুণাদের বাড়ীতেই ছিলেন। অশোক মাকে না ডেকে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়্‌ল।

অশোক নিজের মনকে বোঝাতে চেষ্টা করলে যে, অরুণাকে বিয়ে না কোরে সে মস্ত বড় একটা ত্যাগ করেছে। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই সে বুঝতে পারলে এ ত্যাগ করবার শক্তি তার নাই। অরুণা চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তার সমস্ত উদ্যম ও উৎসাহ নিভে গেল। সমস্ত সংসারটা তার কাছে অত্যন্ত নীরস ও অর্থবিহীন বলে বোধ হোতে লাগ্‌ল। নিজের অস্থির চিত্তকে একটুখানি শান্তি দেবার জন্য সে পাগলের মতন এখানে-সেখানে ছুটে বেড়াতে আরম্ভ কোরে দিলে।

কিছুদিন বাদেই তাদের পরীক্ষার ফল বেরুল। অশোক দেখ্‌লে যে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেচে। কিন্তু এ সংবাদ তার মনে কোনো আনন্দই জাগাতে পারলে না। সে দিন কয়েক ধরে বোটানিক্যাল ও আলিপুরের চিড়িয়াখানার

বাগানে গিয়ে নির্জ্জনে বসে রইল। কিন্তু কিছুতেই সে মনের সে উৎসাহকে ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌লে না। শেষকালে সে স্থির কর্‌লে, তার এই নিষ্ফল জীবনটা নর-সেবাতে কাটিয়ে দেবে।

সে সময় কনখল থেকে একজন বাঙালী সন্ন্যাসী কলকাতায় এসে বাস করছিলেন। একদিন অশোক নির্জ্জনে সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা কোরে তার মনের বাসনা তাঁকে জানালে। পাছে সন্ন্যাসী তাকে প্রত্যাখ্যান করেন এই জন্য সে তাঁর শিষ্য হোয়ে পড়্‌ল। কিন্তু কিছুদিন পরে সন্ন্যাসী আশ্রমে ফিরে যাবার সময় তাকে বলে গেলেন—বৎস, তুমি সংসারে ফিরে যাও, সংসার ধর্ম্ম পালন কর। আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি তোমার মনের সমস্ত গ্লানি চলে যাবে। এই তোমার গুরুর আদেশ।

গুরুর আজ্ঞা শুনে অশোক ফিরে এল। সে তার মনকে বোঝালে এ ঘটনা সংসারে নিত্যই হচ্ছে, এর জন্য সর্ব্বস্ব ছেড়ে দিয়ে বসে থাক্‌লে চল্‌বে না। পুরুষ সে, তাকে জগতের অনেক কাজ করতে হবে। অরুণা যেথানেই থাক, সুখে থাক। নিজের দুর্ব্বলতাকে ফেলে দিয়ে আবার সে পড়াশুনায় মন দিলে।

দুটো বছর দেখতে-দেখতে কেটে-গেল। এম্‌-এ পরীক্ষাতেও অশোক নিজেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছাত্র বলে প্রতিপন্ন করলে। পরীক্ষার ফল প্রকাশ হওয়া মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তারা তাকে ডেকে চাক্‌রী দিলেন। দিন দু-ঘণ্টা পড়াতে হবে দুশো টাকা মাইনে। অশোক আইন পড়ছিল তবুও সে চাক্‌রী নিলে।

অরুণাকে বিয়ে না করার জন্য অশোকের মনে প্রবল

আঘাত লেগেছিল, কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে সে আঘাত সে সাম্‌লে নিলে। কিন্তু অরুণাকে নিজের ঘরে আন্‌তে পারলেন না বলে যোগমায়ার অন্তরে যে আঘাত লাগ্‌ল তা তিনি সাম্‌লাতে পারলেন না। অরুণার প্রতি যে অত্যন্ত অবিচার হোলো, আর সে অবিচারের জন্য যে তিনি ও তাঁর স্বর্গগত স্বামীই দায়ী একথা তাঁকে নিত্যই পীড়া দিতে লাগ্‌ল। অশোক যে তাঁকে এতখানি আঘাত দেবে তা তিনি কোনো দিন কল্পনাও কর্‌তে পারেন-নি। এই ব্যবহারের জন্য ছেলের ওপর তাঁর অত্যন্ত অভিমান হয়েছিল এবং সে অভিমান তিনি কিছুতেই ভুল্‌তে পারলেন না। প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের এই যে মহাপাপ তাঁকে ও তাঁর স্বামীকে স্পর্শ কর্‌ল এবং তাঁর এত বড় দুঃখের কথাটা যে তাঁর ছেলে বুঝতে পার্‌লে না অথবা বুঝেও অবহেলা কর্‌লে এই হোলো তাঁর সব থেকে বড় দুঃখ।

চাক্‌রী হওয়ার বছরখানেক পরে একদিন অশোক তার মাকে এসে বল্লে—মা, বি-এল পরীক্ষার প্রিলিমিনারী পাশ করেছি।

অশোক লক্ষ্য করলে পরীক্ষা-পাশের সংবাদে তার মা যেমন আনন্দিত হন এ ক্ষেত্রে তার কোনো লক্ষণই প্রকাশ পেল না। তার ওপরে যে মার অভিমান আছে তা সে জান্‌ত। সে একটু ক্ষুদ্ধ হোয়ে প্রশ্ন করলে—কিছু বল্লে না যে?

যোগমায়া বল্লেন—উকীল হোতে আর কত দেরী লাগ্‌বে?

অশোক বল্লে—ও, সে এখনো অনেক দেরী। আরও এখনো দুটো বছর রগ্‌ড়াতে হবে।

যোগমায়া বল্লেন—তা হোলে এক কাজ কর্ না। উকীল হোতে তো এখনো দেরী আছে, আমায় এইবেলা কাশীতে পাঠিয়ে দে না।

অশোক হেসে বল্লে—এরি মধ্যে কাশী যাবে কি মা?

যোগমায়া বল্লেন—আর বাবা তুমি কবে পাশ করবে, টাকা রোজগার করবে ততদিন আমি অপেক্ষা করতে পারি, কিন্তু মরণ তো অপেক্ষা করবে না। তুই আমায় কাশী পাঠিয়ে দে, যাবার একটা সুবিধাও হয়েচে।

মার কথা শুনে অশোক আশ্চর্য্য হোয়ে গেল। তাদের সংসারে মাত্র মা আর ছেলে। তাকে একলা ফেলে তার মা যে কোথাও যাবার কল্পনা করতে পারেন তা অশোকের ধারণার অতীত ছিল। মার প্রস্তাবে সে ব্যথা পেলেও মুখে কিছু প্রকাশ না কোরে বল্লে—বেশ তো মা, তুমি কাশী যাও। আমি বাড়ীটা একটু মেরামত কোরে ভাড়া দিয়ে মেসে গিয়ে থাকি।

কথাটা বলেই অশোক চলে যাচ্ছিল এমন সময় যোগমায়া আবার বল্লেন—এখন যাবার একটা সুবিধে জুটেছে কিনা—এই বেলা মহেশ্বরকে প্রণাম কোরে আসি। তোর অসুবিধে হোলেই আমায় লিখ্‌বি, আমি চলে আস্‌ব।

অশোক বল্লে—হঠাৎ তোমার এমন কি সুবিধে জুট্‌ল মা!

যোগমায়া বল্লেন—অরুণার মা যাচ্ছে কিনা, তার সঙ্গেই চলে যাই।

অশোক মনে করেছিল তার মার কাশী যাবার প্রস্তাবটা মৌখিক মাত্র, তিনি তাকে এ-ভাবে ফেলে যেতে পারবেন না। কিন্তু যখন সে দেখলে যে তিনি সত্যিই যাবার যোগাড় করছেন তখন তাকেও সে আয়োজনে যোগ দিতে হোলো।

অরুণার স্বামী শ্রীযুক্ত কাশীশ্বর ভট্টাচার্য্য পরে-পরে দুটি স্ত্রীকে হারিয়ে চিরাভ্যস্ত বিবাহিত জীবনটা বিপত্নীক অবস্থায় কাটাতে না পেরে কলকাতা থেকে ডাগর মেয়ে বিয়ে কোরে এনে কিছুদিন পরেই অসুস্থ হোয়ে পড়্‌ল। কাশীতে তাদের কয়েক পুরুষের বাস! এক সময়ে অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল, বর্ত্তমানে কোনো রকমে সংসার চলে। তাদের বংশানুক্রমে পেশা যজমানী। সংসারে তার এক অতি বৃদ্ধা পিসী ছাড়া আর কেউ ছিল না।

অরুণা সংসার করতে এসেই রুগ্ন স্বামীকে নিয়ে পড়্‌ল। স্বামী বিছানায় পড়ে, শিষ্যবাড়ী যেতে পারে না। এদিকে এক পয়সা আয়েরও সংস্থান নাই; ওদিকে ওষুধ, পথ্য ও আহারের খরচ আছে। দু-চার জন পুরোনো যজমান মাঝে-মাঝে চাল ডাল ও টাকাটা-সিকিটা যা দয়া কোরে দিয়ে যায় তাই নিয়ে সে কোনো ক্রমে সংসার চালাতে লাগ্‌ল। কিন্তু এ রকমে আর কতদিন চল্‌বে? শেষকালে উপায় না দেখে সে তার দুঃখের ইতিহাস মাকে লিখে জানালে।

হরিপ্রিয়া পাড়ারই একজন লোককে তাঁদের বাড়ীখানা পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রী কোরে কাশীতে গিয়ে থাক্‌বেন ঠিক

করলেন। যোগমায়ার ওপর তাঁর কোনো অভিমান ছিল না, অশোক অরুণাকে বিয়ে না করায় তাঁর যে কি রকম লেগেছিল হরিপ্রিয়া তা জানতেন। বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ না হোলেও নিজেদের বিয়ের পর থেকে সুখে-দুঃখে, বিপদ-আপদের মধ্যে দিয়ে এই দুটি নারীব জীবন যে বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল তা ছিন্ন হয়-নি। চিরকালের জন্য শ্বশুরের ভিটা ছেড়ে যাবার আগে হরিপ্রিয়া যোগমায়াকে প্রণাম করতে গিয়ে অরুণার সমস্ত বিবরণ খুলে বল্লেন।

যোগমায়া হরিপ্রিয়াব মুখে সব কথা শুনে বল্লেন—চল বোন্ আমিও তোমার সঙ্গে যাই। আমার পাপের আর প্রায়শ্চিত্ত নেই। এই বেলা গিয়ে বিশ্বেশ্বরের পায়ে পড়ি।

হরিপ্রিয়া কাঁদতে-কাঁদতে বল্লেন—আব সে সব কথা তুলে লাভ কি দিদি? বিশ্বেশ্বরের মনে যা আছে তাই হবে।

সেই দিনই সন্ধ্যার আগে যোগমায়া স্থির কোরে ফেল্লেন যে, হরিপ্রিয়ার সঙ্গে তিনিও কাশী যাবেম। যতদিন তিনি জীবিত আছেন ততদিন অরুণা অন্ততঃ অন্নবস্ত্রের কষ্ট না পায় তার ব্যবস্থা তিনি করবেন্ই।

দিন কয়েক পরেই যোগমায়া হরিপ্রিয়ার সঙ্গে কাশীতে চলে গেলেন। অশোক মাকে বলেছিল যে, তিনি চলে গেলে সে মেসে গিয়ে থাক্‌বে, কিন্তু সে কোথাও গেল না। মা চলে যাওয়ায় তাদের সেই নির্জ্জন বাড়ী আরও নির্জ্জন হোয়ে উঠ্‌ল। অশোক দিনকয়েক এখানে-সেখানে খেয়ে শেষকালে বাড়ীতেই লোক

রেখে খাবারের ব্যবস্থা কোরে ফেল্লে। সে ভেবে দেখ্‌লে এইভাবে একলাই যখন তার জীবন কাটাতে হবে, তখন আর মেসে গিয়ে লাভ কি! একলা থেকে জীবনটাকে অভ্যস্ত কোরে নেওয়া যাক্‌।

অশোকের সংসারে খরচ বেশী ছিল না। তার ওপর সে অত্যন্ত মিতব্যয়ী ছিল। এক বছর চাকরী কোরে সে কিছু সঞ্চয় করেছিল। সেই টাকা দিয়ে সে ভাঙা বাড়ীর সংস্কার করতে লাগ্‌ল।

যোগমায়াকে অশোক মাসে পঞ্চাশ টাকা কোরে পাঠাত। তিনি অশোককে পত্র লিখতেন, কিন্তু তার মধ্যে অরুণাদের কোনো কথাই থাকৃত না। কলেজের ছুটির সময় তার ইচ্ছা হোতো এইবার মাকে গিয়ে একবার দেখে আসি, কিন্তু যোগমায়া কখনো তাকে আসতে লিখতেন না। ছুটির সময়টা বাড়ীতে বসে সে পড়েই কাটিয়ে দিত।

সেই নির্জ্জন বাড়ীতে অশোক একলা একটি বছর কাটিয়ে দিলে। বাড়ী মেরামতের গোলমালে দিনকতক বেশ কেটেছিল, কিন্তু কিছুদিন কাজ চালিয়েই তার জমানো টাকা ফুরিয়ে গেল। তখন সামনেই পরীক্ষা। পাশ কোরে হাইকোর্টে ভর্ত্তি হওয়া ও অন্যান্য খরচ আছে, এই জন্য বাড়ীর কাজ স্থগিত রেখে সে টাকা জমাতে লাগ্‌ল।

দেখতে-দেখতে আর একটা বছরও কেটে গেল। অশোক ওকালতী পরীক্ষা পাশ কোরে মাকে খবর পাঠালে। যোগমায়া কাশী থেকে আশীর্ব্বাদ কোরে তাকে চিঠি লিখলেন। মায়ের

আশীর্ব্বাদ মাথায় ঠেকিয়ে সে চেগো চাপকান পরে হাইকোর্টে বেরুতে লাগ্‌ল!

মায়ের আশীর্ব্বাদ নিয়ে অশোক কাজে লাগ্‌ল বটে, কিন্তু কাজের যিনি দেবতা তিনি দুনিয়ার কারুর আশীর্ব্বাদকেই গ্রাহ্য করেন না। অশোক দিনের পর দিন আদালতে যেতে আস্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু লক্ষ্মীর একটি ফোঁটা আশীর্ব্বাদও তার মাথায় বর্ষিত হোলো না। কলেজের চাকরীটা তখনো সে ছাড়ে-নি, সেইজন্য কোনো রকমে ঠাট বজায় রেখে সে পশার জমাবার চেষ্টা করতে লাগ্‌ল।

একদিন অশোক আদালত থেকে ফিরে সন্ধ্যার পর বৈঠক-খানায় বসে একখানা আইনের কেতাব পড়্‌ছিল, এমন সময় দুটি ভদ্রলোক সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। অপরিচিত ভদ্রলোক দেখে অশোকের প্রাণটা লাফিয়ে উঠ্‌ল। তবে কি দুর্ল্লভ মক্কেল দেবতা এতদিনে ভক্তের নিবেদন শুনেছেন! মক্কেলের সাম্‌নে আনন্দ প্রকাশ হোয়ে পড়া উকীলধর্ম্ম-বিগর্হিত বলে সে গম্ভীর ভাবে প্রতিনমস্কার কোরে তাদের বস্‌তে বলে আবার বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগ্‌ল।

যারা এসেছিল তাদের মধ্যে একজন বল্লে—আমরা হেমনগর থেকে আস্‌চি।

অশোক বই থেকে মুখ না তুলেই বল্লে—হেমনগর, সে আবার কোথায়?

—এই নদীয়া জেলায়। এখান থেকে বেশী দূর নয়, ঘণ্টাখানেকের পথ।

অশোক এবার মুখ তুলে বল্লে—ও, তা আপনাদের কি প্রয়োজন?

একজন প্রশ্ন করলে—আপনার নামই কি অশোককুমার মুখোপাধ্যায়?

—হ্যাঁ।

তারা কোন রকম ভণিতা না কোরে সোজাসুজি বলে গেল যে, তারা হেমনগরের জমিদার রায় বাহাদুর বিধুভূষণ চৌধুরীর কাছ থেকে আস্‌ছে—জমিদার মশায়ের মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করতে। তারা বল্লে—আপনি যা চান জমিদার বাবু তাই দিতে প্রস্তুত। মেয়ে সুন্দরী, সেই মেয়ে ছাড়া তাঁর অন্য কোনও সন্তানাদি নাই।

অশোকের একবার মনে হোলো, মক্কেলের মত মক্কেল বটে। কিছুক্ষণ ভেবে সে বল্লে—দেখুন এ সম্বন্ধে আপনাদের কোনো কথা আমি দিতে পারি না। আমার—

একজন বল্লে—আমরা শুনেছি যে সংসারে আপনি একা।

অশোক বল্লে—হ্যাঁ, আমার পিতা নেই বটে, কিন্তু আমার মা এখনো বর্ত্তমান। তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বল্লেই ভাল হয়।

—তাঁর সঙ্গে কথা বল্‌বার কি এখন সুবিধা হবে?

—না, তিনি কাশীতে আছেন।

লোক দুটি অশোকের মার ঠিকানা নিয়ে সেদিনকার মত চলে গেল।

জমিদারের কর্ম্মচারীরা চলে যাওয়ার পর অশোক বই বন্ধ কোরে চোখ বুঁজে ভাবতে লাগ্‌ল। বিবাহ! এতদিন পরে তার বিয়ের সম্বন্ধ! কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভে এই বিবাহই তো তার জীবনের লক্ষ্য ছিল। এই ধ্রুবতারা লক্ষ্য কোরে জীবনপথের সহস্র বাধা ঠেলে সে এগিয়ে চলেছিল। জীবনযুদ্ধে আজ সে জয়ী! কিন্তু জীবনের আকাশের সেই ধ্রুবতারা আজ খসে অনন্তে মিলিয়ে গিয়েছে! আজ কোথায় তুমি অরুণা! অশোক স্মৃতি-সাগরের তুফানে পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগ্‌ল।

অশোক আবার বই নিয়ে পড়্‌বার চেষ্টা করলে, কিন্তু তখুনি বই বন্ধ কোরে ফেলে সে ভাবতে লাগ্‌ল—কর্ম্মচারীরা বলেচে জমিদারের কন্যা সুন্দরী। আর সুন্দরী যদি না-ই হয় তাতেই কি আসে যায়? রূপ নিয়ে তো ধুয়ে খাব না। সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করাই যদি একমাত্র লক্ষ্য হোতো তা হোলে তখনই অরুণাকে বিয়ে করতে পারতুম। তার মতন সুন্দরী কোথাও দেখেছি—আবার অরুণা! না না দরিদ্রা অরুণা, আমার দারিদ্র্যে যে তোমাকে জড়াই-নি সে জন্য আমার কোন ক্ষোভ নাই। তুমি থাক, সুখে থাক, সমস্ত গ্লানি ভুলে গিয়ে সংসারে তোমার গৌরব প্রতিষ্ঠা কর।

ভাবনার স্রোতে অশোকের মন ভেসে চল্‌ল। জমিদারের কন্যা! আজীবন সে সুখের কোলেই পালিতা হয়েছে। আমার ঘরে এসে যদি তার কষ্ট হয়! যাক্, আর কিছু ভাব্‌ব না মনে কোরে সে

আবার পড়ায় মন দেবার চেষ্টা করলে। কিন্তু তার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ কোরে চিন্তার স্রোত বয়ে চল্‌ল—জমিদারের মেয়ে, ধনীর একমাত্র মেয়ে—স্বভাবতঃই সে অহঙ্কারী হবে। অহঙ্কারী ঝগ্‌ড়াটে মেয়ে নিয়ে ঘর করা তো অসম্ভব। অরুণা তো অহঙ্কারী নয়! আবার অরুণা!

সমস্ত ভাবনাগুলোকে জোর কোরে ফেলে দিয়ে এবার সে উঠে পড়্‌ল।

দিন-চারেক বাদে একদিন সকালবেলা হঠাৎ যোগমায়া কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে মাকে দেখে অশোক বল্লে—কি মা, হঠাৎ যে?

যোগমায়া বল্লেন—এই তোর বিয়ের সম্বন্ধ করতে এসেছি। হেমনগর থেকে লোক গিয়েছিল আমার কাছে, তার সঙ্গে চলে এসেছি।

অশোক বল্লে—হ্যাঁ বড়লোকের বাড়ী থেকে সম্বন্ধ এসেছে।

অশোকের কথার সুর শুনে যোগমায়া তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বল্লেন—বড়লোকের বাড়ী না পছন্দ হয় আরো বাড়ী আছে। এবার তোর বিয়ে দিয়ে আমি যাব।

অশোক একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বল্লে—আর কেন মা? সে সব তো চুকে গেছে—।

অশোকের কথা শুনে যোগমায়ার চোখে জল এল। তিনি একটু চুপ কোরে থেকে অশোকের হাত ধরে বল্লেন—বাবা অশোক আর একটি কথা রাখ। তুই আমায় বড় কষ্ট দিয়েচিস্—

যোগমায়া আর কিছু বল্‌তে পারলেন না। তাঁর চোখ দিয়ে টস্‌-টস্‌ কোরে জল ঝরে পড়্‌তে লাগ্‌ল।

মার চোখে জল দেখে অশোকের চোখেও জল এল। সে বল্লে—তোমার যা ইচ্ছা কর মা। একবার তোমার কথা না শুনে তোমায় কষ্ট দিয়েচি—আর আমি তোমায় কষ্ট দেব না।

পরদিন যোগমায়া ভবানীপুরে জমিদার বাড়ীতে মেয়ে দেখতে গেলেন। ফিরে এসে বল্লেন—খাসা মেয়ে, দিব্যি মেয়ে, আমাদের অরুণার চেয়েও সুন্দরী। ধনের ঘরেই রূপের বাসা।

আবার অরুণা! অশোকের বুকের মধ্যে ধড়াস কোরে উঠ্‌ল।

যোগমায়া বল্লেন—কর্ত্তা-গিন্নি দুজনেই ভালো। আমি তো একেবারে কথা দিয়ে এসেছি। কাল তাঁরা তোকে আশীর্ব্বাদ করতে আসবেন।

হেমনগরের জমিদার রায় বাহাদুর বিধুভূষণ চৌধুরী তাঁর একমাত্র মেয়ের জন্য প্রায় তিন বছর ধরে পাত্রের অনুসন্ধান করছিলেন, কিন্তু মনের মতন পাত্র কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষকালে তিনি গেজেট দেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো ছেলের সন্ধান নিতে লাগ্‌লেন। অশোকের কৃতিত্ব দেখে তিনি এই ছেলেটীর সন্ধান নেবার জন্য লোক লাগালেন। তাঁর লোকেরা অশোকের অজ্ঞাতে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলে যে, ছেলেটী এখনো অবিবাহিত এবং তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হবার কোনো বাধা নাই। সেইদিন থেকেই মেয়ের বিয়ের জন্য তিনি উঠে পড়ে লেগে গেলেন।

পরদিন সকালবেলায় জমিদার মশায় পাত্র মিত্র জন কয়েককে সঙ্গে নিয়ে পাত্র দেখতে এলেন। অশোকের বাড়ীতে পুরুষ অভিভাবক কেউ নাই। সেই কর্ত্তা, সেই বাড়ীর ছেলে। জমিদার মশায় অশোককে দেখে খুশী হলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—তা হোলে বাবাজী বিয়ের দিনটা ঠিক কোরে ফেলা যাক্?

অশোক বিনয়ের সঙ্গে বল্লে—বিয়ের দিন স্থির করতে আমার কোনো আপত্তি নেই; কিন্তু তার আগে আমার একটি কথা আছে।

অশোকের কথা শুনে জমিদার বাবু বন্ধুদের মুখের দিকে চাইলেন। অর্থাৎ—এ আবার কি বলে! তার পরে প্রকাশ্যে বল্লেন—বল বাবাজী কি কথা?

অশোক বল্লে—কথাটা এমন কিছু নয়। আমি বল্‌ছিলুম যে, বিয়ের পর আপনার মেয়েকে আমার এইখানে থাকতে হবে। তবে বছর দুয়েক সে আপনাদের কাছেই থাকবে, কারণ আমার বাড়ী দেখ্‌চেন তো? বাড়ীখানা মেরামত করতে হবে, আর আমার প্র্যাকটিস্‌ও ততদিন একটু জমিয়ে নিতে পারব।

জমিদাব বাবু মনে করেছিলেন হয়তো ছোক্‌রা এবার দেনা পাওনার কথা তুল্‌বে। কিন্তু মা অথবা ছেলে কেউ সে কথার উল্লেখ না করায় তিনি সত্যিই খুশী হলেন। বিশেষ, অশোক যে তাঁর গলগ্রহ হোয়ে থাকতে রাজী নয়—তার এই স্বাধীন স্পৃহাকে তিনি মনে-মনে প্রশংসাই করলেন। অশোকের কথা শুনে তিনি হেসে বল্লেন—এ আর এমন বেশী কি বল্লে বাবাজী?

তোমাদের কি রকম হয় তা তো আমরা জানিনে, তবে আমাদের ঘরের মেয়েরা তো স্বামীরই ঘর করে, বাপের বাড়ী বসে থাকে না। হা হা হা—

অশোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে তার ব্যবহারে জমিদার মশায় ভারি প্রীত হোয়ে ফিরলেন। বাড়ী ফিরতে-ফিরতে তিনি বন্ধুদের বল্লেন—ছেলেটার সহবৎ দেখেছ? আর হবেই না বা কেন, কি রকম লেখাপড়া শিখেচে।

বাড়ীতে ফিরে তিনি স্ত্রীকে বল্লেন—গিন্নি এতদিনে মনের মতন ছেলে পেয়েছি। কিন্তু গরীব বলে তার অভিমানটা একটু বেশী। তোমার মেয়ে যেন তার কাছে কোনো রকমের দেমাক না দেখায়, তাকে সাবধান কোরে দিও।

জমিদার-গিন্নি বল্লেন—আমার মেয়ে সে মেয়ে নয়।

বৈশাখ মাসের এক শুভলগ্নে মহা-সমারোহে হেমনগরের জমিদার রায় বাহাদুর বিধূভূষণ চৌধুরীর একমাত্র মেয়ে মাধবীলতার সঙ্গে অশোকের বিয়ে হোয়ে গেল। বিধূভূষণ মনের মতন জামাই পেয়ে খুশী হোয়ে অশোককে দশ হাজার টাকার একটা তোড়া উপহার দিলেন, তা ছাড়া অন্যান্য যৌতুক তো আছেই।

বিয়ের পরদিন অশোক বৌ নিয়ে তার ভাঙাবাড়ীতে ফিরে এল। পাড়ার লোকেরা বৌ দেখে বল্লে—এমন সুন্দরী মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না, তবে একটু বয়স বেশী হয়েছে।

বৌ-ভাতের হাঙ্গামা চুকে যাওয়ার দিন-সাতেক পরে মাধবী বাপের বাড়ী ফিরে গেল।

বিয়ে-বাড়ীর গোল মিটে যাওয়ার পর যোগমায়া অশোককে বল্লেন—এবার আমি যাই বাবা?

অশোক মনে করেছিল তার বিয়ের পর মা কাছেই থাকবেন, কিন্তু তিনি আবার কাশী ফিরে যাবার প্রস্তাব করায় সে বিস্মিত হোয়ে গেল। সে মাকে থাকবার জন্য একটি বারও অনুরোধ না কোরে কাশীতে পাঠিয়ে দিলে।

শ্বশুরের কাছ থেকে যে টাকা পেয়েছিল সেই টাকায় অশোক তাদের ভাঙাবাড়ীকে একেবারে নতুন কোরে ফেল্লে। সে অধ্যবসায়ী ছিল, প্রাণপণে চেষ্টা কোরে ওকালতীতে একটু পশারও কোরে ফেল্লে। টাকা তেমন রোজগার হোক্ আর নাই হোক্ বুদ্ধিমান উকিল বলে বাজারে তার সুনাম বেরিয়ে গেল।

অশোকের অদৃষ্ট তখন সুপ্রসন্ন। কিছুদিনের মধ্যে একটা বড়দরের উইলের মামলা তার হাতে পড়্‌ল। এই মামলা নিয়ে বাজার তখন খুব সরগরম ছিল, অশোক নিজে লড়ে মামলাটায় জিতে যেতেই তার কাছে মক্কেলের ভিড় লেগে গেল। শুভদিন দেখে মাধবী এসে স্বামীর সঙ্গে সংসার পেতে বস্‌ল।

৭। অরুণা জান্‌ত যে, অশোকই তার স্বামী। শৈশবে, মানুষের মনে প্রেমের বীজ যখন অঙ্কুরিত হয় না তখন থেকেই অশোককে সে স্বামী বলে জান্‌তে শিখেছিল। ছেলেবেলা থেকে সে শুনে আসছিল যে অশোকের সঙ্গে তার বিয়ে হবে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে অশোককে স্বামী বলে জান্‌তে তাকে শিক্ষা দেওয়া হোলো। সে নিজেও অশোককে স্বামী বলে মনে-মনে ভালবাস্‌তে আরম্ভ করলে। সতোরো বছর ধরে অশোক যে তার স্বামী সে বিষয়ে তার একটা সংস্কার পর্য্যন্ত হোয়ে গেল, এমন সময় বয়স বেড়ে যাওয়ার অজুহাতে তাকে অন্য পাত্রে সমর্পণ করা হোলো।

অরুণার সঙ্গে যার বিয়ে হোলো, বিয়ে তার কাছে নতুন নয়। অরুণাকে বিয়ে করবার আগে তার আরও দুবার বিয়ে হোয়ে গিয়েছে। স্বামীর দিক থেকে কোনো আকর্ষণ না থাকায় স্বামীকেও সে ভালবাস্‌তে পারলে না। গণিকা যেমন অর্থের বিনিময়ে দেহ বিক্রয় করে অরুণাও তেমনি আধপেটা আহারের বিনিময়ে তার সামাজিক স্বামীর কাছে দেহ দান করতে লাগ্‌ল।

অরুণার সংসারে সে একা। রুগ্ন স্বামী ও তার অতি বৃদ্ধা পিসি ঘরের মধ্যেই পড়ে থাকে। অরুণা কাজকর্ম্ম করে—এই ভাবেই দিন কাটছিল। কিন্তু সংসারের অনাটন দিনে-দিনে বাড়্‌তে

থাকায় আর কোনো দিকে কূল কিনারা দেখতে না পেয়ে সে তার মাকে চিঠি লিখে জানালে।

যোগমায়া ও হরিপ্রিয়া দুজনেই কাশীতে চলে আসায় তাদের সংসারের অভাব একেবারে ঘুচে গেল। হরিপ্রিয়ার হাতে টাকা ছিল তার অশোকও যোগমায়াকে নিয়মিত যে টাকা পাঠাত তিনি তার সমস্তই অরুণাদের সংসারে ব্যয় করতেন। যোগমায়া কাশীতে এসে প্রথমেই অরুণার স্বামীর চিকিৎসার জন্য ডাক্তার ডাকালেন। ডাক্তার দিন কয়েক রুগী দেখে হাল ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন। তিনি বল্লেন—ও রোগ সারবার নয়, কিছুদিন ভুগে মারা যাবে। রুগীর পোষ্টাই খাবারের ব্যবস্থা কর।

রুগী বোধ হয় আরও কিছুদিন বাঁচ্‌ত, কিন্তু পোষ্টাই খাবার সহ্য করতে না পারায় তার অন্য উপসর্গ দেখা দিল, ফলে তার জীবনের মেয়াদ শীগ্‌গীরই ফুরিয়ে গেল।

অরুণার স্বামীর মৃত্যুতে তাদের বাড়ীর তিনটি বিধবা পাড়া কাঁপিয়ে চীৎকার করলেন। বৃদ্ধা পিসি কাঁদলেন ভাইপোর শোকে, কিন্তু হরিপ্রিয়া ও যোগমায়া যে কার শোকে কাঁদলেন অরুণা তা বুঝতে পারলে না। স্বামীর সৎকার হোয়ে গেলে অরুণা থান কাপড় পরে বিধবা সাজ্‌ল।

হরিপ্রিয়া ও যোগমায়া কাশীতে এসেই গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র নিয়েছিলেন। অরুণা বিধবা হওয়ার পর দুই মায়ে মিলে তাকেও মন্ত্র নেওয়ালেন।

গুরুদেব এসে অরুণাকে সান্ত্বনা দিতে লাগ্‌লেন—এই যে

সংসার দেখ্‌চ, বাবা, মা, ভাই, বোন, স্বামী, বন্ধু এরা কেউ নয়—পৃথিবীর সবই অনিত্য, একমাত্র সত্য স্বরূপের ধ্যান কর। এই মন্ত্র তোমায় দিচ্ছি, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে ঘুম থেকে উঠে এই মন্ত্র একান্ত-চিত্তে ধ্যান করবে, গুরুর কৃপায় তুমি মুক্তি পাবে।

অরুণা রাত থাক্‌তে উঠে ছাতের ঘরে গিয়ে গুরুর মন্ত্র ধ্যান করতে লাগ্‌ল। কিন্তু সে দেখ্‌লে যে, চিত্তকে একাগ্র করবার চেষ্টা করলেই রাজ্যের চিন্তা এসে তাব মনকে জড়িয়ে ধরে। তারপরে অরুণোদয়ের সঙ্গে দেবালয়ের শানাই যখন ভৈরবীর তানে আকাশ বাতাস আকুল কোবে তুল্‌ত সে সময় তার মন সেই সুরের মতন বাতাসে মিলিয়ে যেস্তে চাইত, গুরুর দেওয়া মন্ত্রের কথা আর মনেই থাকৃত না। কতক্ষণ এই ভাবে কেটে যেত তার পরে হঠাৎ একবার চমক ভেঙে সে নীচে নেমে আস্‌ত।

প্রায় বছরখানেক চেষ্টা কোবে একাগ্রতা আন্‌তে না পেবে একদিন সে মন্ত্র জপ করা ছেড়ে দিলে। গুরুকে বলে দিলে—নরক ভোগের ভয় আমার নেই, ইহজীবনেই সে পালা আমি শেষ কোরে যাব।

অরুণার জীবন এই ভাবেই কাটছিল কিন্তু এরই মধ্যে আবার একটুখানি বৈচিত্র্য এসে দেখা দিলে। তাদের বাড়ীটা ছিল একেবারে গঙ্গার ধারে। মন্ত্র নেওয়ার পর হরিপ্রিয়া ভোর পাঁচটায় উঠে স্নান কোবে এক-গলা জলে দাঁড়িয়ে জপ করতেন। পশ্চিমের শীত সহ্য করা তাঁর অভ্যাস ছিল না। সেবার শীত পড়ার পরও কিছু কাল এই ভাবে জপ করার ফল তিনি হাতে

হাতেই পেয়ে গেলেন। দিনকয়েক সান্নিপাতিক জ্বরে ভুগে তিনি কাশী পেলেন।

মার মৃত্যুতে অরুণা কাঁদ্‌লে, আকুল হোয়ে কাঁদ্‌লে। যোগমায়া তাকে সান্ত্বনা দিতে লাগ্‌লেন। অরুণা তাঁকে জড়িয়ে ধরে বল্লে—আমার কি হবে বড় মা!

যোগমায়া তার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বল্লেন—তোর কোনো ভাবনা নেই। তোব যাতে কষ্ট না হয় আমি তার ব্যবস্থা কোবে যাব, আমায় বিশ্বাস কর্।

মায়েব শোকও সহ্য হোয়ে গেল, সময়ে সবই সহ্য হয়। অরুণার পিস্‌-শ্বাশুড়ীও মারা গেলেন, সংসারে রইল সে আর যোগমায়া। এই দুটি নারীকে বিধাতা যে নিগূঢ় বন্ধনে বেঁধেছিলেন, সেই বন্ধনের মূল কি তা তাবা দুজনেই জান্‌ত। কিন্তু সে সম্বন্ধে দুজনেব কেউ কখনো আলোচনা করত না, সেই কথাটাই ছিল তাদেব জীবনের চরম দুঃখ।

যোগমায়া প্রতিদিন সন্ধ্যার পর বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখ্‌তে যেতেন, অরুণাও তাঁর সঙ্গে যেত। সে দেখ্‌ত, বড় মা কি একাগ্রমনে বিশ্বেশ্বরের ধ্যানে মগ্ন হোয়ে যান; অরুণার ইচ্ছা হোতো সে-ও ঐ ভাবে নিজেকে দেবতার চরণে নিবেদন করে, কিন্তু শত চেষ্টা কোরেও সে তার মনকে জড় করতে পারত না। স্নেহ, প্রেম ও ভক্তিশূন্য মন নিয়ে সে এক অপূর্ব্ব জীবন বহন কোরে চল্‌ল।

অশোক মাধবীকে নিয়ে নতুন সংসার পেতে মাকে লিখ্‌লে—

মা এতদিনে আমার ওপরে তোমাব রাগ নিশ্চয় চলে গিয়েছে। আমি একলা কাছারীই করি, না সংসার দেখি। মাধবী কিছুই গুছিয়ে উঠ্‌তে পারে না।

যোগমায়া এতদিন কাশীতে এসেছেন কিন্তু তিনি অশোককে অরুণার কোনো সংবাদই পাঠান-নি। ছেলের চিঠি পেয়ে তাঁর মন তার কাছে ছুটে গেল বটে, কিন্তু তিনি অরুণাকে একলা ফেলে কি কোরে যাবেন? অরুণাও অশোকের বাড়ীতে গিয়ে থাক্‌তে রাজী হবে কিনা তাও তিনি বুঝতে পারছিলেন না। অশোকের চিঠি পেয়ে তিনি এক সমস্যায় পড়্‌লেন।

কয়েকদিন ভেবে তিনি ছেলেকে অরুণার সমস্ত সংবাদ খুলে লিখে দিলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর কি করা কর্ত্তব্য তাও জানতে চাইলেন।

সেদিন অশোক কাছারীতে যাবার জন্য বাড়ী থেকে বেরুচ্ছে এমন সময় দরোয়ান এসে যোগমায়ার চিঠিখানা তার হাতে দিলে। অশোক গাড়ীতে বসে মার চিঠিখানা পড়ে সেখানা পকেটে মুড়ে রেখে দিলে। অশোক জান্‌ত যে, অরুণা সুখেই আছে, পূর্ব্বস্মৃতি ভুলে স্বামী-সোহাগে সে সুখে ঘরকন্না কর্‌চে। তার সুখের জন্য সে নিজে ইচ্ছা কোরে বুক পেতে যে আঘাত নিয়েছিল সে জন্য সে মনে-মনে গর্ব্বিত ছিল। এতদিন পরে অরুণার প্রকৃত অবস্থা জেনে প্রথমে সে স্তম্ভিত হোয়ে গেল। তারপর ধীরে-ধীরে অতীত জীবনের এক-একখানা কোরে পাতা তার মনের ভেতর দিয়ে উল্টে যেতে লাগ্‌ল। অরুণা!

চিরদুঃখিনী অরুণা! তার এই দুঃখের জন্য দায়ী কে? আমি? আমি যদি তখন তাকে বিয়ে করতুম তা হোলে তার আজ এ দুর্দ্দশা হোতো না। কিন্তু আমি তার ভালোর জন্যই তখন তাকে বিয়ে করি-নি। তাকে ভালবাসি বলেই, পাছে তার ভবিষ্যতে কষ্ট হয় সে কথা ভেবেই তখন বিয়ে করতে চাই-নি। তার দুঃখের জন্য অদৃষ্টই দায়ী, আমি কি করব?

কিন্তু অদৃষ্টই বা কি কোরে বল্‌ব? এই দুঃখ তো জোর কোরে তার ওপর চাপান হয়েছে! তখন তার সতেরো বছর বয়স ছিল, আর তিনটি বছর—না হয় কুড়ি বছর বয়সই তার হোতো। আমার স্ত্রী হবে সে, তার বয়স বাড়্‌ল কিনা সে বোঝাপড়া তো আমারই ছিল।

গাড়ী থেকে নেমে অশোক কাছারীতে গিয়ে ঢুক্‌ল। সেদিন তার গোটাদুয়েক মামলা ছিল, কিন্তু অরুণার চিন্তা তাকে এমন কোরে পেয়ে বস্‌ল যে, সে কোনো কাজেই মন দিতে পার্‌লে না। মামলা দুটো অন্য একজনের ওপর ফেলে দিয়ে সে কাছারী থেকে বেরিয়ে বোটানিক্যাল গার্ডেনে যাবার একখানা টিকিট কেটে জাহাজে গিয়ে উঠ্‌ল।

অশোক সারাদিন একটা গাছের তলায় বসে কাটিয়ে দিলে। সন্ধ্যার কিছু আগে বাগানের মালী এসে তুলে দেওয়ায় সে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়্‌ল।

অশোককে সন্ধ্যার মধ্যেই বাড়ীতে ফির্‌তে হোতো। এ ছিল মাধবীর হুকুম। সেদিন সন্ধ্যা উৎরে যাওয়ার পরও অশোক

বাড়ী ফিরছে না দেখে মাধবী উদ্বিগ্ন হোয়ে উঠেছিল। সে নিজের ঘরটির একটি জানলায় বসে স্বামীর কথা ভাবছিল এমন সময় অশোক ঘরের মধ্যে ঢুকল। অশোককে দেখে মাধবী ছুটে এসে তার বুকের ওপরে দুখানা হাত রেখে বল্লে,—আজ এত দেরী হোলো যে?

অন্যদিন অশোক মাধবীকে আদরে জড়িয়ে ধরে তার কথার উত্তর দিত; কিন্তু সেদিন সেই আলিঙ্গনপ্রয়াসী হাত দুখানা সে টেনে না নিয়ে চাপকানেব বোতাম খুল্‌তে আরম্ভ কোরে দিলে।

অশোকের মুখের দিকে চেয়ে মাধবী আবার জিজ্ঞাসা করলে—আজ বুঝি কাছারীর পর অন্য কোথাও গিয়েছিলে?

পোষাক ছাড়তে-ছাড়তে অশোক বল্লে—হ্যাঁ, আজ শিবপুরের বাগানে গিয়েছিলুম।

মাধবী আব্দারের স্বরে বল্লে—একলা যাওয়া হোলো, আর আমি বুঝি কেউ নই! আমাকে একদিন নিয়ে যেতে হবে।

অশোক একটু বিষাদের হাসি হেসে বল্লে—বেশ!

অশোকের যে একটা কিছু হয়েছে সে কথা মাধবী তার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিল। সে ভেবেছিল, স্বামীকে জিজ্ঞাসা করবার আগেই সে তাকে সব কথা খুলে বল্‌বে। এইজন্য সে এতক্ষণ নানারকম কথা দিয়ে সেই আসল কথাটা বের করবার চেষ্টা কোরে দেখ্‌লে। কিন্তু অশোকের সেই বিরাট গাম্ভীর্য্য কাটল না দেখে অবশেষে মাধবী ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিতে বাধ্য হোলো। তার শেষ প্রশ্নের উত্তর শুনে অশোকের মুখের দিকে ছল্‌ছলে

চোখ নিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বল্লে—তুমি আজ ও রকম কোরে কথা বল্‌ছ কেন—

আর বল্‌তে হোলো না। এই অবধি বলার পরই মাধবীর চোখ উপ্‌চে গালের ওপরে জল গড়িয়ে পড়্‌ল। তারপরে সে আঁচলে মুখ ঢেকে কাঁদতে আরম্ভ কোরে দিলে।

এবার অশোকের হার মানতে হোলো। সে মাধবীকে কাছে টেনে এনে বল্লে—মাধবী, আজ আমার মনটা ভারী খারাপ হোয়ে আছে। আমি তো তোমায় কিছু বলি-নি, তবে তুমি কাঁদলে কেন?

কিছু না বলাই যে মাধবীর কান্নার কারণ সে কথা সে স্বীকার করলে না। সে বল্লে—কেন মন খারাপ হয়েছে? মা ভাল আছেন, আমি আজ তাঁর চিঠি পেয়েছি।

অশোক বল্লে—আচ্ছা মার চিঠিখানা আমায় দাও, আর মা আমায় একখানা চিঠি লিখেছেন সেখানা তুমি পড়।

মাধবী বল্লে—কোথায় তোমার চিঠি?

অশোক চাপকানটা দেখিয়ে দিতেই সে ছুটে গিয়ে যোগমায়ার চিঠিখানা বের কোরে পড়্‌তে আরম্ভ কোরে দিলে।

অশোক হাত মুখ ধুয়ে ঘরে ফিরে এসে দেখলে যে, মাধবীর চিঠি-পড়া তখনো শেষ হয়-নি। সে ইজি-চেয়ারে লম্বা হোয়ে শুয়ে পড়্‌ল।

মাধবী চিঠি-পড়া শেষ কোরে অশোককে ধাক্কা দিয়ে

বল্লে—এ চিঠির কিছু তো আমি বুঝতে পারলুম না। অরুণাদের বাড়ীতেই তো মা আছেন?

অশোক মাধবীকে অরুণার কোনো কথাই বলে-নি। অরুণার কথা তাকে বল্‌বার কোনো দরকারই হয়-নি। আর সে ইচ্ছা কোরেই অরুণার প্রসঙ্গ কখনো তুল্‌ত না। মাধবীর কথা শুনে সে বল্লে—অরুণার কথা শুন্‌বে?

মাধবী কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু চোখ দুটোকে বড় কোরে তার কাছে সরে এল।

অশোক বল্লে—তা হোলে চল খাওয়া-দাওয়া সেরে আসি। আমাদের জন্য সবাই বসে আছে।

সেদিন রাতে বিছানায় শুয়ে অশোক মাধবীর কাছে অরুণা ও তার জীবনের সমস্ত ইতিহাস খুলে বল্লে। মাধবী ধনীর মেয়ে, সুখের কোলেই সে পালিতা। তার চারিপাশে সে আনন্দ ও প্রাচুর্য্যই দেখেছে। অসম্ভবের আব্দার ছাড়া জীবনে তাকে নিরাশ হোতে হয়-নি। অরুণার দুঃখ যে কি গভীর তা কল্পনা করতে না পার্‌লেও অশোকের মুখে তার দুঃখের কাহিনী শুনে মাধবীর চোখে জল এল। সে অশোককে বল্লে—আহা অরুণা ভারী দুঃখী তো! আচ্ছা তাকে এখানে নিয়ে এস না। মা বোধ হয় তার জন্যই কাশীতে পড়ে রয়েছেন। তাকে আন্‌লে মা-ও আস্‌বেন।

অশোক বল্লে—কিন্তু, অরুণা আমার এখানে এসে থাক্‌তে চাইবে কেন? আমার ওপরে নিশ্চয় তার রাগ আছে। আমি

যদি তখন তাকে বিয়ে করতুম তা হোলে তার আজ এ অবস্থা হোতো না।

মাধবী বল্লে—আচ্ছা তুমি অরুণাকে বিয়ে করলে না কেন?

অশোক বল্লে—তা হোলে মাধবী দেবীর বিয়ে হোতো কার সঙ্গে?

ঘরের আলো নেভান ছিল। মাধবী অশোকের এ প্রশ্নের কোনো জবাব না দিয়ে অশোককে জড়িয়ে ধর্‌লে। অশোক তাকে চুমু দিয়ে বল্লে—কি বল? আমার কথার জবাব দিলে না?

মাধবী বল্লে—তুমি মাকে লিখে দাও অরুণাকে নিয়ে চলে আস্‌তে। অরুণা নিশ্চয় আস্‌বে।

অশোক বল্লে—কি কোবে জান্‌লে?

মাধবী বল্লে—জানি গো জানি। সে নিশ্চয় এখনো তোমায় ভালবাসে। তুমি ডেকেছ শুন্‌লে সে না এসে থাক্‌তে পার্‌বে না।

অশোক বল্লে—এ তোমার আন্দাজী কথা।

মাধবী বল্লে—আমি কিন্তু আন্দাজে আরও একটি কথা জান্‌তে পেরেছি।

অশোকের বুকের মধ্যে ধ্বক্ কোরে উঠ্‌ল। মাধবী যে কি আন্দাজ করেছে সে কথা বুঝতে তার একটুও দেরী হয়-নি। সে মাধবীর গালটা টিপে দিয়ে বল্লে—দুষ্টু, তোমার এই শেষের আন্দাজটা মোটেই ঠিক হয়-নি। সেই জন্য বুঝে নিতে হচ্ছে প্রথম আন্দাজটাও ঠিক নয়।

মাধবী চেপে ধর্‌লে—আমার আন্দাজ কি বল।

অশোক বল্লে—না তা বল্‌ব না।

এবার মাধবীরই গরজ। সে বল্লে—আচ্ছা তুমি অরুণাকে একেবারেই ভালবাস না?

প্রশ্ন শুনে অশোক চুপ কোরে রইল। মাধবী আবার জিজ্ঞাসা করলে—ওগো বল না।

অশোক বল্লে—দেখ ছেলেবেলা থেকে এতদিন যাকে স্ত্রী বলে জান্‌লুম তাকে আজ ভালবাসি না এ কথা কি কোরে বল্‌ব। তবে এখনকার ভালবাসা আর তখনকার ভালবাসার মধ্যে অনেক-খানি তফাৎ হোয়ে গেছে।

মাধবী বল্লে—কি কতকগুলো ছাই-ভস্ম বল্লে আমি বুঝতে পারলুম না। অরুণাকে তুমি ভালবাস কি না বল না?

অশোক দেখ্‌লে মহা বিপদ উপস্থিত। সে মাধবীকে আলিঙ্গন কোরে বল্লে—মাধবী তুমি বিশ্বাস কর আমি তোমায় ছাড়া আর কারুকে ভালবাসি না।

মাধবী বল্লে—কালই তুমি অরুণাকে নিয়ে আসবার জন্য মাকে লিখে দাও। তুমিই তো তার কষ্টের জন্য দায়ী।

অশোক কোনো কথা বল্লে না। মাধবী আবার বল্লে—লিখ্‌বে তো?

এবার অশোক বল্লে—আচ্ছা লিখ্‌ব, কিন্তু সে এলে তুমি তার সঙ্গে ঝগড়া কর্‌বে না তো?

মাধবী বল্লে—না গো না, তোমার অরুণার সঙ্গে আমি ঝগড়া কর্‌ব না।

———

মাধবীর সঙ্গে অরুণার কথা আলোচনা কোরে অশোকের মন অনেকটা হাল্কা হোয়ে গেল। মাধবী অরুণাকে নিয়ে আস্‌বার জন্য চিঠি লিখ্‌তে বলেছিল কিন্তু তাকে নিয়ে আসবার প্রস্তাব করাটা ঠিক হবে কিনা অশোক কিছুতেই তা বুঝতে পারছিল না। অশোক মাধবীকে চিন্‌ত। অরুণা এসে তাদের বাড়ীতে থাকৃলে মাধবীর দিক দিয়ে সে কোনো রকম আঘাতই পাবে না। আর অরুণা যদি সেই অরুণাই থাকে, কঠোর সংসার যদি তার স্বভাবের সমস্ত কোমলতা মুছে না নিয়ে গিয়ে থাকে তা হোলে অরুণার সঙ্গেও তার সংসারের কারুর অবনিবনা হবে না। এ সব দিক দিয়ে কোনো গোলই নাই, কিন্তু আসল কথা এই যে, অরুণা তার বাড়ীতে এসে থাকৃতে রাজী হবে কি না?

দিন তিনেক ভেবে অশোক ঠিক করলে যে, অরুণা নিশ্চয়ই তার বাড়ীতে এসে থাকৃতে রাজী হবে না। তা যদি হোতো তা হোলে এত দিনে তার মা-ই তাকে নিয়ে চলে আস্‌তেন। মা যখন এ সম্বন্ধে কোনো কথাই লেখেন না, তখন এ বিষয়ে সে-ও কিছু লিখ্‌বে না! সে মার চিঠির উত্তরে লিখ্‌লে—মা, অরুণার এ দুর্ভাগ্যের জন্য প্রধানতঃ আমি আর কতকাংশে আমরা

সকলেই দায়ী। আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত এই যে, সুখের সময় তোমায় কাছে পেলুম না।

মাধবী ধনীর মেয়ে। সে বাপ মার একমাত্র সন্তান বলে তার আদরের পরিমাণ খুবই বেশী ছিল। কিন্তু রূপ ও অর্থের কোনো গর্ব্বই তার ছিল না। সে জান্‌ত যে, তার স্বামী দরিদ্র ছিল, কিন্তু দরিদ্র হোলেও অর্থের প্রতি তার কোনো লোভ নাই। বড়লোকের মেয়ে বিয়ে করতে গিয়ে যে তার স্বামী অসম্ভব একটা দর হেঁকে বসে-নি এ জন্য স্বামীর প্রতি তার শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। কিন্তু মাধবীর অভিমান ছিল দুর্জ্জয়।

অশোকের কাছে অরুণার কাহিনী শুনেই তার প্রতি সহানুভূতিতে মাধবীর হৃদয় আকুল হোয়ে উঠেছিল। তাকে কাছে নিয়ে এসে তার ক্ষতবিক্ষত মনটাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য মাধবীর কোমল প্রাণ উদগ্রীব হোয়ে উঠ্‌ল। অরুণা এলে সে কোন ঘরে থাক্‌বে, তাকে কি বল্‌বে, কি রহস্যে তার ম্লান মুখ খুশীতে ভরিয়ে দেবে সে দিন রাত মনে-মনে তারই কল্পনা করতে লাগ্‌ল। কিন্তু অরুণার আসার কোনো লক্ষণই না দেখে সে একদিন অশোককে জিজ্ঞাসা করলে—কৈ, অরুণাকে নিয়ে মাকে আস্‌তে লেখ-নি বুঝি?

অশোক ঠাট্টা কোরে গম্ভীরভাবে বল্লে—না আমি তাকে আস্‌তে বারণ কোরে দিয়েছি যে।

অশোকের কথা শুনে মাধবীর রাগ হোলো। সে জিজ্ঞাসা করলে—কেন?

মাধবীর প্রশ্নের মধ্যে বেশ একটু ঝাঁজ্ ছিল। অশোকের কাণে সেটা ঝণাৎ কোরে বাজ্‌ল। এ সুর তার কথায় কখনো প্রকাশ পায়-নি। সে তার কথার কোনো জবাব না দিয়ে চুপ্ কোরে বসে রইল।

মাধবী সেই সুরে আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কেন তাদের আস্‌তে বারণ করা হয়েছে সে কথা বল্‌তে আপত্তি আছে কি?

অশোক উদাসভাবে বল্লে—না আপত্তি কিসের।

—তবে, শুনি না কারণটা!

এবার অশোক তার কথার মধ্যে একটু শ্লেষ মিশিয়ে বল্লে—কি জানি যদি বড়লোকের মেয়ে মাধবী দরিদ্রা অরুণাকে অবহেলা করে, সেই ভয়ে—।

অশোকের কথা শুনে মাধবীর মুখ লাল হোয়ে উঠ্‌ল। কথাটা বলেই অশোক বুঝতে পারলে যে, তার অন্যায় হয়েছে। সে তখুনি তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু মাধবী তার কাছ থেকে সরে গিয়ে বল্লে—বড়লোকের মেয়ে হোলেও কারুকে অবহেলা কর্‌তে আমি শিখি-নি। সেটা তুমিই একচেটে করেচ।

এই বলে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অশোক চুপ কোরে বসে-বসে ভাবতে লাগ্‌ল—দেখ, কি থেকে কি হোলো! এই কলহের মূল কথাটাই যে মিথ্যা মিথ্যা—অতি বড় মিথ্যা। ঠাট্টাটা শেষ অবধি বজায় রাখ্‌তে না পেরে নিজে রেগে গিয়ে মাধবীর মনে কতখানি আঘাত দিয়ে ফেলেছে

তা বুঝতে পেরে অশোকের অনুতাপ হোতে লাগ্‌ল। সে বসে-বসেই ডাক দিলে—মাধবী!

মাধবীর কোনো সাড়া না পেয়ে অশোক একবার চারদিক খুঁজে এল, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পেলে না। সেদিন সন্ধ্যায় তার এক জায়গায় নেমন্তন্ন ছিল, সেখানে যাবারও সময় হোলো কিন্তু মাধবীর সঙ্গে মিটমাট না কোরে সে কিছুতেই বাইরে বেরুতে পারছিল না। অশোক আর একবার মাধবীকে ডাকবে কিনা ভাব্‌চে এমন সময় মাধবী ঘরের মধ্যে এসে বল্লে—আমি বাড়ী যাচ্ছি।

অশোক দেখ্‌লে যে, তার রাগ তখনো পড়ে-নি। সে বল্লে—কখন ফিরবে?

অশোকের প্রশ্নে মাধবীর রাগ আরও চড়ে গেল। সে কোনো জবাব দিলে না। অশোক আবার জিজ্ঞাসা করলে—আজই ফিরবে তো?

মাধবী ঘাড় নেড়ে জানালে—না।

অশোক বল্লে—কাল?

মাধবী আবার ঘাড় নাড়্‌লে।

অশোক আর কোনো প্রশ্ন না কোরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নেমন্তন্ন সেরে অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরে অশোক দেখ্‌লে যে, ঘর খালি, মাধবী নাই। মাধবী যখন বাড়ী যাবার কথা বলেছিল তখন অশোক মনে করেছিল যে, সেটা তার মনের কথা নয়, খালি তাকে শাসন হচ্ছে মাত্র। কিন্তু বাড়ীতে ফিরে যখন সত্যই সে

দেখলে যে, মাধবী চলে গেছে তখন তার রাগ হোলো। একবার তার মনে হোলো, এই বুঝি ধনীর মেয়ের গুণ প্রকাশ হোতে আরম্ভ হোলো। কিন্তু তখুনি সে নিজের মনকে ধমক্ দিয়ে বুঝিয়ে দিলে যে, মাধবী কখনো সে রকম মেয়ে নয়। আজকের ব্যাপারের জন্য সে-ই তো দায়ী। অরুণাকে নিয়ে আস্‌বার জন্য কেন যে সে মাকে অনুরোধ কোরে চিঠি লেখে-নি সে কথা মাধবীকে খুলে বল্লে সে কখনো রাগ কর্‌ত না। মাধবী চলে গিয়েছে সে আবার কালই আস্‌বে। তাকে ছেড়ে সে কখনো থাকৃতে পারবে না।

তিন চার দিন চলে গেল কিন্তু মাধবী ফির্‌ল না। অশোক তাকে চিঠি লিখ্‌লে। মাধবী লক্ষীটি চলে এস, তোমার অভাবে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। তুমি কবে ফির্‌বে?

মাধবী তার জবাব দিলে—আমি গেলে তোমার অরুণা কষ্ট পাবে, এক্ষেত্রে আমার না যাওয়াই ভাল।

মাধবীর চিঠি পড়ে অশোকের পৌরুষে আঘাত লাগ্‌ল। তার মনে হোলো আমার চিঠির এই জবাব! সে মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করলে আর কখনো মাধবীকে আসবার জন্য চিঠি লিখ্‌বে না। নিজের মনকে সে বোঝাতে লাগ্‌ল, মাধবীর অভাবে তার কোন কষ্ট হবে না। এত দিন তো সে একাই কাটিয়েছে! সারা জীবন একলাই কাটাতে হবে সেই ভাবেই তো সে নিজের জীবনকে গড়ে তুলছিল, তবে কেন সে একলা কাটাতে পারবে না।

অশোক আবার নতুন কোরে তার জীবনকে গড়ে তোলবার চেষ্টা সুরু করলে। সে তার সমস্ত মন নিয়ে কেতাবের সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়্‌ল।

মাধবী হঠাৎ সন্ধ্যেবেলায় একটা ছোট্ট প্যাঁটরা নিয়ে বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হওয়ায় তার মা অবাক হোয়ে গেলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কিরে হঠাৎ—বলা নেই, কওয়া নেই—।

মাধবী বল্লে—আমি কি কুটুম বাড়ী এসেছি নাকি মা, যে আস্‌বার আগে বলে-কয়ে লোক পাঠিয়ে তবে আসতে হবে?

মা বল্লেন—পাগ্‌লী মেয়ের কথা শোনো একবার! আমি তোকে তাই বল্লুম বুঝি? আমরা যে কাল বাড়ী যাব, এখন থেকে গিয়ে পূজোর ব্যবস্থা করতে হবে না?

হেমনগরের জমিদার-বাড়ীতে খুব ধূমধাম কোরে পূজো হোতো। পূজোর সময় এক মাস্‌ ধরে জমিদার বাড়ীতে যাত্রা, থিয়েটার, নাচ, গান ও নানা রকমের আমোদ চলে। জমিদার বাবু যেখানেই থাকুন না কেন, পূজোর মাস দুয়েক আগে তিনি গ্রামে ফিরে আসেন, আর তখন থেকেই উৎসবের বন্দোবস্ত সুরু হয়।

মার কাছে পূজোর কথা শুনে মাধবীর চোখে জল এল। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়ার কথা তখনো সে ভুল্‌তে পারে-নি। বিয়ে হোলে মেয়েকে যে কতখানি দূরে যেতে হয় সে দিন যেন বিশেষ কোরে সে সেটা অনুভব কর্‌লে। এই পূজোর সময়

বাড়ী যাবার আগে তার মনের মতন জিনিষ কেনবার জন্য বাড়ীর লোকদের আহার-নিদ্রা বন্ধ হোতো, আর আজ বাড়ীর সবাই দেশে যাবে সে সংবাদ পর্য্যন্ত তাকে দেওয়া হয়-নি— সকলেই জানে সে স্বামীর কাছে আছে, সুখেই আছে; স্বামীকে ছেড়ে মাধবী কোথাও থাক্‌তে পাবে না। কিন্তু সেই স্বামী আজও তাকে চিন্‌তে পার্‌লে না। সে ভাবে, তার অরুণাকে সে কথা শোনাবে!

ভাবতে-ভাবতে মাধবীব চোখে জল এল। 'সে তার মাকে জড়িয়ে ধরে বল্লে—মা, তোমরা আমায় এমন পর কোরে দিও না।

একমাত্র আদরের মেয়েকে কাঁদতে দেখে ও তার মুখে ঐ সব কথা শুনে জমিদার-গিন্নিবও চোখে জল এল। তিনি মেয়েকে জড়িয়ে ধবে বল্লেন—ছি মা কাঁদতে নেই। স্বামীর ঘর তো সব মেয়েই করে। তোকে কি আমবা পর করতে পারি, তুই তো আমাদেব সব। আমি মনে কবেছিলুম এখন কটা দিন যাক্; মাসখানেক পরে অশোকের ছুটি হোলে তোদের দুজনকেই একসঙ্গে নিয়ে যাব। তা তুই বুঝি হিসেব কোরে আগেই চলে এসেচিস্?

মাধবী তাব পরের দিনই বাবা-মায়ের সঙ্গে দেশে চলে গেল। দেশে উৎসবের আবহাওয়ায় পড়ে স্বামীর ওপরে তার রাগ চলে গিয়েছিল। অশোকের চিঠি পেয়ে তখুনি সেখানে ছুটে যাবার তার ইচ্ছা হয়েছিল, কিন্তু এর আগে অনেকবার সে মাকে বলেছিল সে পুজোর পরে ফিরবে বলে এসেছে। এখন হঠাৎ কলকাতায়

ফিরে যেতে চাইলে মা বাবা কি মনে করবেন সেই ভেবে সে যায়-নি, তার ওপরে অশোককেও একটু জব্দ করবার ইচ্ছা যে ছিল না তা নয়।

অশোক মনে করেছিল যে, মাধবীর অভাবে তার কোনো কষ্টই হবে না। যে স্ত্রী স্বামীর অমতে রাগ কোরে বাপের বাড়ী চলে যায়, তার পরে ঐ রকম চিঠি লেখে তার সঙ্গে কি কোরে সম্পর্ক রাখা চলে! মাধবী সম্বন্ধে নিজের মনকে সে যতদূর সম্ভব কঠোর করতে লাগ্‌ল। দু-চার দিন তার তেমন কষ্টও হয়-নি। কিন্তু রাগের প্রথম ঝোঁকটা কেটে যাওয়ার পরই সে বুঝতে পারলে যে, মাধবী যা লিখেছে সে তার অভিমান মাত্র। সে অভিমানের কারণও যে যথেষ্ট ছিল সে কথাও সে অস্বীকার করতে পারলে না। মাধবী যে তার জীবনের কতখানি জায়গা জুড়ে বসেছিল সে কাছে থাকতে অশোক তা বুঝতে পারে-নি। মাধবীর জন্য তার কষ্ট হোতে লাগ্‌ল, কিন্তু তবুও সে তাকে আস্‌বার জন্য আবার চিঠি লিখ্‌তে পারলে না। মাধবী বলে দিয়েছে যে, সে আস্‌বে না, তা ছাড়া সে আরও এমন কথা বলেছে যার জন্য অশোকের পক্ষে তাকে চিঠি লেখা অসম্ভব ছিল।

অশোক ভাবতে লাগ্‌ল যে, নারী জাতিটা কি হাল্কা। এত ভালবাসা তার মুখের একটি কথাতেই ভেসে গেল? তাকে ছেড়ে মাধবীর নিশ্চয় কোনো কষ্ট হচ্ছে না। কষ্ট হোলে সে এতদিন তাকে ছেড়ে সেখানে থাকতে পারত না।

দিন কয়েক পরেই হাইকোর্ট বন্ধ হবে। অশোক মনে

করেছিল এই লম্বা ছুটিতে সে মাধবীকে নিয়ে বেড়াতে বেরুবে, কিন্তু মাধবী চলে যাওয়ায় সমস্ত ব্যবস্থাই উল্টে গেল। অশোক একবার ভাবলে যে, ছুটির তিনমাস মার কাছে গিয়ে থাকবে। কাশী যাবার কথা মনে হোতেই তার অরুণার কথা মনে পড়ল। সে ভাবতে লাগল, অরুণা কি তাকে এখনো মনে করে? কখনো না। মাধবীই যদি তাকে এমন কোরে ভুলে থাকতে পারে তবে অরুণা তাকে মনে রাখবে কেন? অরুণাও তাকে ভুলে গেছে। অরুণার মন থেকে তার স্মৃতি মুছে গেছে এই চিন্তা তার কাছে অসহ্য হোয়ে উঠল। তার মাধবীর ওপর রাগ হোতে লাগল। অশোকের মনে হোলো, মাধবী যদি তার জীবনে না আসত তা হোলে নারী-হৃদয়ের এই অভিজ্ঞতা তার হোতো না। সে চিরদিনই মনে করতে পারত অরুণা এখনো তাকে মনে করে। এই সুখেই তো সে জীবন কাটিয়ে দিচ্ছিল আর সারা জীবন কাটিয়েও দিত। মাধবী তার জীবনের এই সুখ টুকুও মুছে নিয়ে গেছে।

অশোক ঠিক করলে মার কাছেও যাওয়া হবেনা। ছুটির এই তিনটি মাস নানা জায়গায় সে একলাই ঘুরে আসবে।

অশোকের ছুটি হোয়ে গেল। সে পশ্চিম-যাত্রার আয়োজন করচে এমন সময় শ্বাশুড়ীর কাছ থেকে তার নামে একখানা চিঠি এসে হাজির হোলো। শ্বাশুড়ী নিজের হাতে জামাইকে লিখেছেন যে, এবার পূজোর সময় নিশ্চয় অশোককে তাঁদের বাড়ীতে যেতে হবে। বিয়ের পর একবারও সে শ্বশুরের

দেশে যায়-নি। সেখানকার প্রজারা তাদের ভবিষ্যৎ মালিককে দেখ্‌তে চায়। শহরের ছেলে হোলেও সেখানে তার কোনো কষ্ট হবে না, ইত্যাদি।

শ্বাশুড়ীর চিঠি পেয়ে অশোক মহা ফাঁপরে পড়্‌ল। তার মনে হোলে, যাকে নিয়ে তার শ্বশুর-বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক সে-ই যখন তাকে এমন কোরে ছেড়ে চলে গিয়েছে তখন আর সেখানকার সঙ্গে সম্পর্ক কিসেব ? অশোকের মনের কোনে একটা সন্দেহ উঁকি দিচ্ছিল —মাধবীর সঙ্গে তার যে ঝগড়া হয়েছে সে কথা কি শ্বাশুড়ী জানেন না! তাই বা কি কোরে হবে? আজ প্রায় তিন মাস সে সেখানে রয়েছে এর ভেতর আমাদের মধ্যে একবারও চিঠি লেখালেখি হয়-নি, শ্বশুর-শ্বাশুড়ী কি এই থেকে কিছু বুঝ্‌তে পারেন-নি ?

অশোক একবার মনে করলে যে, শ্বাশুড়ীর পত্রের কোনো জবাব না দিয়েই সে পশ্চিমে চলে যাবে। কিন্তু যদি তাঁরা সত্যিই কিছু না জানেন তা হোলে চিঠির উত্তর না দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় হবে। অশোক ঠিক করলে যে, মাধবী যদি তাঁদের কিছু না জানিয়ে থাকে তবে সে-ই সব জানাবে। শ্বাশুড়ীর চিঠি পাওয়ার পরদিন সে তাঁকে লিখে দিলে—আপনার নিমন্ত্রণ আমার শিরোধার্য্য। কিন্তু, মাধবী আমার সঙ্গে ঝগড়া কোরে চলে গেছে, আর তাকে আস্‌তে বলা সত্ত্বেও সে আসে নি। সে আমায় স্পষ্ট জানিয়েছে যে, আমার কাছে সে আর আস্‌বে না। যাকে নিয়ে আপনাদের সঙ্গে সম্পর্ক তার সঙ্গেই যদি আমার সম্পর্ক উঠে যায় তা হোলে আমি কি কোরে আপনাদের ওখানে যাব ?

পশ্চিম-যাত্রার আয়োজনটা আপাততঃ স্থগিত রেখে অশোক চিঠির ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

পূজোর আর দিনকয়েক মাত্র দেরী আছে। হেমনগরের জমিদার-বাড়ীতে ধূম লেগে গিয়েছে! সেদিন সকালবেলায় কর্ত্তা ও গিন্নিতে বসে আশ্রিত-পরিজনদের মধ্যে কাকে কি কাপড় দেওয়া হবে তার পরামর্শ কর্ছিলেন এমন সময় ঝি গিন্নি-মার হাতে অশোকের চিঠিখানা এনে দিলে। গিন্নি জামাইকে চিঠি লিখে উত্তরের প্রতীক্ষা করছিলেন। এ চিঠি যে অশোকের কাছ থেকেই আসচে তা বুঝতে পেরে তিনি তাড়াতাড়ি খাম ছিঁড়ে চিঠি পড়তে লাগ্লেন। চিঠি পড়েই তাঁর মুখ-চোখ লাল হোয়ে উঠ্ল। বিধূভূষণ জিজ্ঞাসা কর্লেন—কি গো কার চিঠি! অমন কোরে উঠ্লে যে?

গিন্নি চিঠিখানা তাঁর হাতে দিয়ে বল্লেন—দেখ তোমার মেয়ের কাণ্ড।

কর্ত্তা চিঠি পড়ে বল্লেন—ঠিক! ঠিক কথাই লিখেছে। স্ত্রীকে নিয়েই তো শ্বশুর-বাড়ীর সম্পর্ক, তা যদি সেই সম্পর্কই উঠে যায়—

তাঁর কথা শেষ করতে না দিয়েই জমিদার-গিন্নি হাঁক দিলেন—মাধি!

মাধবী তখন ঘরের বাইরে একটা খোলা ছাতে সাত আটজন সমবয়সী মেয়ের সঙ্গে গোল হোয়ে বসে আড্ডা জমাচ্ছিল, এমন সময় মার ডাক তার কাণে গেল। জমিদার-গিন্নির ডাক শুনেই

সকলে বুঝতে পার্‌লে—একটা কিছু হয়েছে! একজন জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কি হয়েচে রে মাধি?

মাধবী বল্লে—কি জানি, বোস্ না তোরা, শুনে আসি।

মাধবী সেখান থেকে উঠে বাবা মা যে ঘরে আছেন সেই ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল। তার বন্ধুরাও সব গুটিগুটি দরজার পাশে এসে দাঁড়াল। মাধবী ঘরের মধ্যে ঢোকামাত্র গিন্নি বল্লেন—সর্ব্বনাশী, এ কি, হয়েচে! অশোকের সঙ্গে ঝগড়া কোরে চলে এসেচ?

বন্ধুরা যে সবাই দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে মাধবী তা বুঝতে পেরেছিল, তাদের সাম্‌নেই এই অপমান হওয়ায় লজ্জায়, ক্ষোভে তার মাথা কাটা যেতে লাগ্‌ল। মার কথার কোনো জবাব চট্ কোরে তার মাথায় এল না। একটু চুপ কোরে থেকে সে বল্লে—আর সে যে আমায় যা-তা বলে!

মাধবীর মা বল্লেন—বেশ কর্‌বে বল্‌বে। আমি আমার জামাইকে চিনি না? আবার গুমর কোরে একখানা চিঠি পর্য্যন্ত লেখা হয়-নি।

বিধূভূষণ বল্লেন—বেটি মিথ্যেবাদী, কাল পর্য্যন্ত আমায় বলেচে অশোক ভাল আছে, তার চিঠি পেয়েচে।

বন্ধুদের সাম্‌নে অপমানটা ক্রমেই গুরুতর হোয়ে উঠ্‌চে দেখে মাধবী আর বাক্যব্যয় না কোরে তখুনি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই কেঁদে ফেল্লে। সে বেরিয়ে আস্‌তেই সঙ্গিনীদের মধ্যে

একজন বলে উঠ্‌ল—ওরে মাধি, বরের সঙ্গে ঝগড়া কোরে এসেচিস্‌?

একজন বল্লে—সেই কথা আবার ওর বর শ্বশুর-শাশুড়ীকে লিখে পাঠিয়েচে!

মাধবী আর সহ্য করতে পারলে না। সে বলে উঠ্‌ল—বেশ করেছে, তোর তাতে কি?

সঙ্গিনীরা সবাই অবাক হোয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। সে সবাইকে ঠেলে ছুটে নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ কোরে এক কোনে বসে কাঁদতে আরম্ভ কোরে দিলে।

জমিদার-গিন্নি জামাইয়ের চিঠি পাওয়া অবধি এমন গোল সুরু করেছিলেন যে, বাড়ীর ছাতে পাখী পর্য্যন্ত বস্‌তে পার্‌ছিল না। মাধবী যে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া কোরে চলে এসেছে সে কথা বোধ হয় গ্রামের কারুর জানতে বাকী রইল না। তিনি সবাইকে বল্‌তে লাগ্‌লেন—আমার অমন জামাই, আর হতভাগা মেয়ে কিনা তার সঙ্গে ঝগড়া করে! তিনি কর্ত্তাকে দিয়ে অশোককে চিঠি লেখালেন। নিজে লিখ্‌লেন—পাগ্‌লী মেয়ে তোমায় যা বলেছে ভুলে যাও বাবা। তুমি এলে তাকে তোমার পায়ে ধরিয়ে ক্ষমা চাওয়াব।

মেয়েকে চিঠি দেখিয়ে জমিদার-গিন্নি বল্লেন—এই কাগজেই তুই তাকে আস্‌তে লিখে দে।

মাধবী মার হাত থেকে চিঠিখানা নিয়ে ঘরের মধ্যে একবার ঢুকে তখুনি বেরিয়ে এসে তাঁর হাতে চিঠি ফিরিয়ে দিল। তিনি কাগজখানার চার পিঠ দেখে বল্লেন—কৈ, লিখ্‌লি-নি?

—তুমি তোমার চিঠি পাঠিয়ে দাও, আমি আলাদা লিখব'খন।

মাধবীর মা খুসী হোয়ে বল্লেন—আচ্ছা আজই চিঠি লিখে দে। ছি মা, স্বামীর সঙ্গে কি অমন কোরে ঝগড়া করে?

তিন দিন বাদে কর্ত্তা-গিন্নির চিঠি নিয়ে জমিদার-বাড়ীর পুরোনো সরকার অশোকের বাড়ীতে গিয়ে হাজির হোলো।

অশোক শ্বশুব ও শ্বাশুড়ীব চিঠি পড়ে সরকার মশায়কে বল্লে—আজ আপনি আমাদের এখানেই থাকুন, কাল যাওয়া যাবে। কি বলেন ?

সরকার বল্লে—বেশ তো কালই যাবেন।

অশোক চিঠি দু-খানা পকেটে ফেলে অতিথিব আহারের ব্যবস্থা কর্‌তে বাড়ীব ভেতব চলে গেল।

আহারাদির পব অশোক চিঠি দু-খানা নিয়েই শুতে গেল। শ্বশুর-বাড়ীর লোকের সাম্‌নে চিঠিগুলো তখন ভাল কোরে পড়া হয়-নি। শ্বাশুড়ীর চিঠিখানা খুলতেই এবার চিঠিব কোনে একখানি পরিচিত হাতের কয়েকটি ছোট-ছোট অক্ষরের দিকে তার নজর পড়্‌ল—তুমি যদি না আস, নিশ্চয় জেনো আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না।

মাধবীর এই ছোট্ট আহ্বানের পশ্চাতে কতখানি অভিমান লুকিয়ে আছে মনে ভেবে অশোকের প্রথমটা ভারি মজা লাগ্‌ল। সে বেশ বুঝতে পারলে যে, তার চিঠির ফলে সেখানে মাধবীর ওপর খুব এক চোট্ হোয়ে গিয়েছে। তার সঙ্গে দেখা হোলে মাধবী প্রথমে কি কর্‌বে অশোক মনে-মনে সেই কথা আলোচনা করতে লাগ্‌ল। কিন্তু বেশীক্ষণ সে শুয়ে থাকতে পারলে না, মাধবীর কথা ভাবতে-ভাবতে অশোক শয্যা ছেড়ে উঠে বাইরে চলে গেল।

শ্বশুর-বাড়ীর সরকার মশায় তখন খেয়ে-দেয়ে দিবা-নিদ্রার

আয়োজন করছিলেন এমন সময় অশোক সেখানে উপস্থিত হোয়ে বল্লে—সরকার মশায় আজ হেমনগরে যাবার ট্রেণ আছে?

আধা দিবা-নিদ্রাটি মাটি হোলো মনে কোরে সরকার মশায় উত্তর দিলেন—হাঁ্যা, এই বেলা তিনটায় একখানা ট্রেণ আছে।

অশোক জিজ্ঞাসা করলে—কটায় গিয়ে সেখানে পৌছয়?

—সে প্রায় রাত্রি আটটা।

অশোক বল্লে—তা হোলে আজই রওনা হওয়া যাক্। কাল এক দল বন্ধু আস্‌বার কথা আছে, তারা যদি এসে পড়ে তা হোলে হেমনগরে আর যাওয়া হবে না। এই বেলা চলুন যাই, কি বলেন?

সরকার মশায় বল্লেন—বেশ।

তল্পী খুল্‌তে না খুল্‌তেই সরকার মশায় তল্পী গুছোতে সুরু করলেন। অশোক একটা ছোট ট্রাঙ্কে খানকয়েক ধুতি ও জামা নিয়ে হেমনগরে যাত্রা কর্‌লে।

অশোক যখন হেমনগরের ষ্টেশনে এসে নাম্‌ল তখন প্রকৃতির চোখে সন্ধ্যার ঘোর লেগেছে। নির্জ্জন ষ্টেশন, একটা গাড়ী পর্য্যন্ত নেই। আগে জানান হয়-নি বলে জমিদার-বাড়ী থেকেও গাড়ী কিংবা লোকজন কিছুই আসে-নি। বৃদ্ধ সরকার মশায় একটা ছেলেকে ডেকে তার মাথায় অশোকের পেঁট্‌রা আর নিজের ছোট্ট পুঁট্‌লী চাপিয়ে দিয়ে জামাই বাবাজীকে নিয়ে অগ্রসর হলেন।

ষ্টেশন থেকে জমিদার-বাড়ী মাইলখানেক রাস্তা হবে।

কিছুক্ষণ হেঁটেই তারা বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছল। জমিদারবাবু তখন তাঁর নিয়মিত সান্ধ্য-আড্ডাটি জমিয়ে বসেছেন এমন সময় অশোককে নিয়ে সরকার মশায় সেখানে উপস্থিত হলেন।

বিধুভূষণ জামাইকে দেখে আনন্দে লাফিয়ে উঠ্‌লেন। অশোক তাঁকে প্রণাম কর্‌তেই তিনি তাকে একেবারে জড়িয়ে ধরে বাড়ীর ভেতর টেনে নিয়ে চল্লেন।

বাড়ীর ভেতর মেয়ে-মজলিশ তখন জম্‌জম্‌ কর্‌ছিল। বিধূভূষণ জামাইকে নিয়ে একেবারে সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। মজলিশে গ্রামের অনেক বাড়ীর গিন্নি, মাধবী ও তার অনেক বন্ধুও বসেছিল। বিধূভূষণ একজন অপরিচিত লোককে নিয়ে হঠাৎ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হওয়ায় অনেকে উঠে পাশের ঘরে সরে গেলেন, দেহের বিপুলতা অথবা তৎপরতার অভাবে যাঁরা সর্‌তে পারলেন না তাঁরা মাথার ঘোম্‌টা টেনে দিয়ে মুখ ঢেকে ফেল্লেন। বিধূভূষণের সে সব দিকে লক্ষ্য নেই। তিনি নিজের স্ত্রীকে বল্লেন—গিন্নি কাকে নিয়ে এসেছি দেখ!

বিধূভূষণ জামাইকে সেইখানে ছেড়ে চলে যেতেই যাঁরা পাশের ঘরে লুকিয়েছিলেন তাঁরা বেরিয়ে এলেন। যাঁরা ঘোম্‌টায় মুখ ঢেকেছিলেন তাঁরা ঘোম্‌টা খুলে ফেল্লেন। গিন্নি অশোককে সেইখানে বসিয়ে হাঁক দিলেন—মাধি!

কিন্তু কোথায় মাধি! সে যে কখন সেখান থেকে সরে পড়েছিল তা কেউ জান্‌তে পারে-নি। দু-একজন উৎসাহ কোরে তার অনুসন্ধানে গেল, কিন্তু তারা আর ফির্‌ল না।

জমিদার-বাড়ীতে তখন থেকেই ধুম লেগে গেল। সেই রাতে পুকুরে জাল ফেলা হোলো। মাধবীর বন্ধুরা অশোকের মাথায় চাঁটি-টাটি দেবার বন্দোবস্ত কর্‌ছিল; কিন্তু কি কোরে সে কথা ফাঁস হোয়ে যেতেই জমিদার-গিন্নি উচ্চকণ্ঠে সবাইকে বলে দিলেন—অশোককে কেউ বিরক্ত কোরো না, সমস্ত দিন রেলের ঝাঁকুনিতে তার কষ্ট গিয়েছে।

সেদিন খাওয়া-দাওয়া শেষ হোতে অনেক রাত হোয়ে গেল। অশোক তার নির্দ্দিষ্ট ঘরে এসে বড় পালঙে গা ঢেলে দিলে। শ্বশুর-বাড়ীতে এসে অবধি সে মাধবীকে দেখ্‌তে পায়-নি, সে সে ভাব্‌লে এইবার মাধবী আস্‌বে। কিন্তু কোথায় মাধবী! ঝি পান নিয়ে এল, একজন চাকর গড়্‌গড়া নিয়ে এল। সে চলে গেল, আর একজন এসে কথা নেই বার্ত্তা নেই একেবারে তার পা ধরে টিপ্‌তে আরম্ভ কোরে দিলে। থাম্‌কা একজন পা টিপ্‌তে থাকায় অশোকের যেন কি রকম অস্বস্তি বোধ হোতে লাগ্‌ল। সে দু-একবার আপত্তি কর্‌লে, কিন্তু তার কথায় কান না দিয়ে সে ব্যক্তি কলের মতন পা টিপে যেতে লাগ্‌ল।

অনেকক্ষণ এই ভাবে কাটবার পর অশোক লোকটিকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—এই, তোদের খাওয়া হয়েছে?

—না বাবু।

—গিন্নি-মারা কখন খাবেন?

—সে এখনো দেরী আছে।

শ্বশুর-বাড়ীর চাকরকে আর বেশী জিজ্ঞাসা করা যায় না। সে

চুপ কোরে পড়ে তামাক টান্‌তে লাগ্‌ল্। তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়্‌ল।

শ্বশুর-বাড়ীর বিছানায় শুয়ে অশোক স্বপ্ন দেখ্‌ছিল—মাধবী তাকে চিঠি লিখেছে, সে আব তার কাছে ফির্‌বে না। সে কাশীতে গিয়ে বিশ্বনাথের পায়ে আত্মসমর্পণ করেছে। অশোক তাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য গাড়ী কোরে ষ্টেশনে যাচ্ছে, কিন্তু গাড়ী যেন আর চল্‌তেই চায় না। কোনো রকমে সে ষ্টেশনে এসে পৌঁছল বটে, কিন্তু ষ্টেশনে পা দেওয়া-মাত্র ট্রেণখানা ছেড়ে দিলে। দুঃখে ক্ষোভে তার কণ্ঠ শুকিয়ে উঠ্‌ল। ঘুমের মধ্যেই তার এত কষ্ট হোতে লাগ্‌ল যে, ঘুম ভেঙে গেল।

ঘুম ভেঙে যেতে অশোক দেখ্‌লে, বাতি নেভান। বাইবে ঝিল্লির ঝঙ্কার, যেন নিশীথিনী তার সহস্র সহচরীকে নিয়ে খেলায় মত্ত হয়েছে। প্রথমটা সে কিছু বুঝতে পারলে না। তাব মনে হোতে লাগ্‌ল—এ কোথায় এসেচি! তার পরে সব মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল। সে দেখ্‌লে,—পাশে মাধবী নেই, মাধবীর বালিশটা পড়ে রয়েছে মাত্র। অশোক খাটের ওপরে উঠে বস্‌ল। ঘরের এক দিক্‌কার একটা জানলা খোলা ছিল, অশোক দেখ্‌লে সেই জানলা দিয়ে এক ঝলক্ জোৎস্না ঘরে পাথরের মেঝের ওপর এসে পড়েছে, আর সেই জানলার রেলিং ধরে তার দিকে পেছন ফিরে একটি নারী দাঁড়িয়ে। কে সে নারী তা বুঝতে অশোকের দেরী হোলো না, সে আস্তে-আস্তে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

অশোক মনে করেছিল যে, সে কাছে গেলেই মাধবী তার দিকে ফির্‌বে, কিন্তু সে একেবারে তার গা ঘেঁসে গিয়ে দাঁড়াল তবুও মাধবী তার দিকে ফির্‌লে না। এবার অশোক তার একখানা হাত ধরে তাকে কাছে টেনে নিয়ে এল। মাধবী মৃদু আকর্ষণে অশোকের হাত থেকে নিজেকে মুক্ত কোরে আঁচলখানা গলায় জড়িয়ে স্বামীকে প্রণাম কর্‌লে। অশোক এবার মাধবীকে কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে এল। চাঁদের আলোতে অশোক দেখ্‌তে পেলে মাধবীর দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়্‌ছে। সে তাকে দু-হাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বল্লে—মাধবী আমার ওপর রাগ করেচ ?

মাধবী কোনো কথা না বলে এক হাত দিয়ে অশোকের মুখ চেপে ধর্‌লে। অশোক তার হাতখানা নামিয়ে দিয়ে বল্লে—বল মাধবী, আমার ওপরে—

মাধবী আবার তার মুখ চেপে ধরে বল্লে—চুপ কর, ও ঘরে বাবা মা শুয়ে আছেন, শুন্‌তে পাবেন।

অশোক মাধবীকে টেনে খাটের ওপরে নিয়ে বসালে। সে বল্লে—জান মাধবী, তুমি আমায় আস্‌তে না লিখ্‌লে আমি কখনো আস্‌তুম না। আমি পশ্চিমে যাবার সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক কোরে ফেলেছিলুম।

মাধবী বল্লে—তুমি না এলে আমার সঙ্গে আর দেখা হোতো না।

—কেন ?

মাধবী বল্লে—কেন আবার কি! আমায় অপমান কোরে মাকে চিঠি লেখা হোলো কিনা আমি ঝগড়া কোরে চলে এসেছি। আমার যে কি অবস্থা হবে সেটা একবার ভেবে দেখ্‌লে না। তুমি না এলে আমায় জলে ডুবে মর্‌তে হোতো।

অশোক বল্লে—তুমিই তো আমার সঙ্গে ঝগ্‌ড়া কোরে চলে এলে। আমি তোমায় যেতে বারণ করলুম—

মাধবী বল্লে—আর আমায় যে অত বড় কথাটা বল্লে—

এবার মাধবী অশোকের কোলে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে আরম্ভ কর্‌লে। অনুতপ্ত অশোক তার মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বল্লে—আমায় ক্ষমা কর মাধবী, আমি অরুণাকে—

মাধবী অশোকের কথা থামিয়ে দিয়ে বল্লে—ও কথা আর তুলো না। তোমার বাড়ীতে তুমি যাকে ইচ্ছা আন্‌বে না আন্‌বে তাতে আমার বল্‌বার কি অধিকার।

এবার অশোক হতাশভাবে বল্লে—মাধবী, বুঝ্‌লুম যে, তুমি আমায় মোটেই ভালবাস না। তোমার কাছে এত কোরে ক্ষমা চাইলুম তবুও ক্ষমা কর্‌লে না।

মাধবী ধীরে অশোকের কোল থেকে মুখ তুলে দু-হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে সজল চোখে তার দিকে চেয়ে রইল। সে চাহনির মাদকতায় বিহ্বল হোয়ে অশোক মাধবীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—আমায় ভালবাস?

মাধবী আবার অশোকের বুকে মুখ লুকিয়ে ফেল্লে। অশোক জোর কোরে তার মুখখানা তুলে বল্লে—বল?

মাধবী ধীবে-ধীরে বল্লে—ভালবাসি, কিন্তু তুমি আমায় একটুও ভালবাস না।

—কিসে বুঝ্‌লে ?

—যাক্ সে কথা।

—না তোমায় বল্‌তেই হবে।

—আমি না হয় রাগ কোবে তোমায় চিঠি লিখেছিলুম, কিন্তু তুমি আমায় জোর কোরে নিযে গেলে না কেন ? পুরুষেব ভালবাসা ঐ রকমের।

অশোকের মনে হোলো, মাধবী ঠিক কথাই বলেছে। মাধবী অভিমান করেছিল, সে অভিমানে আঘাত দিয়ে সে বড় নিষ্ঠুরতা করেছে। তার সেই ব্যবহারের জন্য সে লজ্জিত হোলো। এক-দিন তার মনে হযেছিল নাবী জাতিটাই অত্যন্ত হাল্কা, আজ তার মনে হোলো পুরুষের মত অপদার্থ জীব আর নাই। সে মাধবীকে বুকের কাছে টেনে নিযে তাকে চুমু দিযে বল্লে—ঠিক বলেচ মাধবী, আমারই উচিত ছিল তোমায় নিয়ে যাওয়া, আমি অন্যায় রাগ কোরে বসেছিলুম। কিন্তু তোমার অভাবে আমার যে কি কষ্ট গিয়েছে তা তুমি জান না।

মাধবী অশোকের গায়ে হাত বুলিয়ে বল্লে—সত্যি, তুমি বড্ড রোগা হোয়ে গিয়েছ।

তারপর স্বামী-স্ত্রীর মিলনের প্রলাপ। সারারাত্রি কথার আর শেষ নাই। ভোর হবার একটু আগে মাধবী বল্লে—এবার আমি পালাই, না হোলে ভারি নিন্দা হবে।

দুর্গাপূজো শেষ হবার পর অশোকের মন পালাই-পালাই করতে আরম্ভ কোরে দিলে। এই ক'মাস নির্জ্জলা বিরহের পর মাধবীকে একান্তরূপে পাবার জন্য তার পিপাসী হৃদয় উন্মুখ হোয়ে উঠেছিল, কিন্তু পূজোবাড়ীতে সমস্ত দিন তাকে কাজে-কর্ম্মে অন্য দিকে থাকতে হয়, তা ছাড়া রাতেও যখন সে ঘরে আসে তখন সে এত ক্লান্ত হোয়ে পড়ে যে, ঘুমোতে পারলে বাঁচে। কোনো কোনো দিন কাজের হাঙ্গামায় রাত্রে তার ঘরে আসা হোয়ে ওঠে না।

বিজয়ার রাত্রে অশোক মাধবীকে বল্লে—চল মাধবী, এবার কলকাতায় যাই। বাড়ী খালি পড়ে রয়েছে, চাকর-বাকরেরা যে কি কর্‌চে তার ঠিকানা নেই।

মাধবী বল্লে—কেন, এখানে আর ভাল লাগ্‌চে না বুঝি?

অশোক বল্লে—সত্যি বল্‌চি, তোমার বাবা ও মার এত যত্ন ও আদর পেয়েও আমার এখানে থাকতে ভালো লাগ্‌চে না।

মাধবীর ঠোঁটের কোনে একটু দুষ্টু হাসি খেলে গেল। সে বল্লে—কেন বল দিকিন্?

—কেন! তা বল্লে বিশ্বাস হবে?

—শুনিই না কেন?

—এই তোমাকে এত কাছে পেয়েও পাচ্ছি না, বাড়ীতে গেলে তো আর সে ভয় নেই। এখন ছুটি আছে, আমার মনে হচ্ছে যে ছুটিটা মাঠে মারা গেল।

মাধবী হাসতে-হাস্‌তে বল্লে—বিশ্বাস হোলো না। তা হোলে আমায় ছেড়ে এতদিন ছিলে কি কোরে?

অশোক বল্লে—ও কথা আর তুলো না মাধবী।

মাধবী তাড়াতাড়ি সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বল্লে-কবে যাবে? মা বাবা ভেবে আছেন একেবারে কালী-পূজো পর্য্যন্ত তোমায় রাখ্‌বেন।

অশোক বল্লে—ও বাবা, তা হোলে আমি আর বাঁচ্‌ব না।

মাধবী বল্লে—কালই যাওয়া হবে না, দাঁড়াও আমি মার কাছে কাল কথা পাড়্‌ব।

মেয়ের মুখে জামাইয়ের প্রস্তাব শুনে জমিদার-গিন্নি অশোককে বল্লেন—হ্যাঁ বাবা, তোমার এখানে কষ্ট হচ্ছে?

অশোক বল্লে—এত সুখেও যদি কষ্ট হয় তবে তো আমি স্বর্গে গিয়েও সুখ পাব না। কতকগুলো মামলা ফেলে এসেছি আসবার সময় সে-গুলোর কিছু বন্দোবস্ত কোরে আস্‌তে পারি নি।

গিন্নির মুখে অশোকের যাবার প্রস্তাব শুনে বিধুভূষণ বল্লেন—এরি মধ্যে যাবে কি? এবার অশোক এসেছে বলে কালীপূজোর উৎসবের জন্য ভাল-ভাল বাইজী বায়না করা হয়েছে। দু-দিনের জায়গায় তিন দিন নাচের বন্দোবস্ত হোলো—আর ও চলে যাবে!

তিনি অশোককে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন—কি হে তুমি নাকি যেতে চাইচ?

অশোক আবার সেই মামলার কথা তোলায় তিনি বল্লেন—রেখে দাও তোমার মামলা। ওহে পূজো রোজ আসে না।

অশোক আবার কি বল্‌তে যাচ্ছিল এমন সময় বিধুভূষণ বল্লেন—বাবাজী এই বয়সে অত টাকার মায়া কোরো না। এখানে তোমার কষ্ট হচ্ছে না তো?

অশোক লজ্জিত হোয়ে বল্লে – না কষ্ট কিসের?

—ব্যস্! তা হোলে একেবারে সেই কালীপূজোর পর আমাদের সঙ্গেই ফিরবে।

যাবার মতলোব ফেঁসে গেল দেখে অশোকেব মনটা একেবারে দমে গেল। সে ভাব্‌লে কি আর করা যাবে, দিন কয়েক এই স্নেহের অত্যাচার সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই। রাত্রিবেলা মাধবী জিজ্ঞাসা করলে—কি গো বাবা কি বল্লেন?

অশোক বল্লে—তিনি এখন যেতে দিলেন না। বল্লেন যে, আমার জন্য খুব সুন্দরী দু-জন বাইজী আনাচ্ছেন, এখন যাওয়া হোতে পারে না।

মাধবী বল্লে—কি?

অশোক কোনো উত্তর দিল না। মাধবী আবার জিজ্ঞাসা করলে —কি বল্লে! বাবা কি আনাচ্ছেন?

অশোক যেন আপনার মনে বল্‌তে লাগ্‌ল—আমিও ভাবলুম বাইজীদের সঙ্গে দিন-কয়েক একটু ফুর্ত্তি-টুর্ত্তি কোরে তাব পর কলকাতায় যাওয়া যাবে। কি জান, পূজো তো আব রোজ আসে না।

মাধবী এবার অশোকের পিঠে একটা কীল বসিয়ে দিয়ে বল্লে—ধেৎ, খালি চালাকী! সত্যি, বাবা কি বল্লেন বল না?

—বল্লুম তো, ঐ কথাই বল্লেন। আর সুন্দরী বাইজীর কথা শুনে আমারও যেতে আর মন চাইচে না।

—আচ্ছা, আমি কাল সকালে বাবাকে জিজ্ঞাসা করবো তো?

অশোক একটু চুপ কোরে থেকে শেষে বল্লে—কেন আব জিজ্ঞাসা করা, মাঝে থেকে আমার ফুর্ত্তিটা মাঠে মারা যাবে।

মাধবী অশোককে আবার এক ধাক্কা দিযে বল্লে—তবে! এতক্ষণ চালাকি হচ্ছিল আমার সঙ্গে?

জামাই যে কেন চলে যেতে চাইচে সংসারঅভিজ্ঞা জমিদার গিন্নি তার কতকটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। তিনি মাধবীকে বলে দিলেন—অশোকের বোধ হয় অযত্ন হচ্ছে। দুপুরবেলা এদিকে-সেদিকে ধেই-ধেই কোরে নেচে না বেড়িয়ে ওর কাছে যেও, আর রাত্রে অশোকের সঙ্গে খেয়ে নিয়ে ঘরে যাবে—বুঝ্‌লে।

সেদিন থেকে মাধবীর ঘবে-আসার নিয়ম বদ্‌লে যাওয়ায় অশোক ভারী খুশী হোয়ে উঠ্‌ল। মাধবী তাকে বল্লে—তোমার মতন এমন নির্লজ্জ আমি দেখি-নি। বাবা মা সবাই টের পেয়ে গেলেন যে, এই জন্য তুমি বাড়ী যেতে চাইছিলে।

অশোক বল্লে—আমি তো আর বাড়ী যেতে চাই না। বাইজী আস্‌বে শুনে আমি বলে দিয়েছি একেবারে জগদ্ধাত্রী পূজোর পর যাব।

মাধবী বল্লে—আসুক না কত বড় বাইজী আমি দেখ্‌ব'খন।

অরুণার দিন আর কাটে না। সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি একা একঘেয়ে জীবন যাপন তার কাছে অসহ্য হোযে উঠ্‌ছিল। বাড়ীতে সে আর যোগমায়া ছাড়া আর কেউ নাই। যোগমায়া আজকাল প্রায়ই সমস্তক্ষণই মন্ত্র জপ ও ধর্ম্মপুস্তক নিয়েই থাকেন। অরুণা আবার নতুন কোরে দিনকয়েক মন্ত্র জপ আরম্ভ কোরে দেখ্‌লে, কিন্তু এবাবেও সে মন বসাতে পার্‌লে না। কাশীতে অরুণার অন্য আত্মীয় কেউ ছিল না যে, সে তাদের কাছে যায় অথবা তাদের কাছে নিয়ে এসে তার একঘেয়ে জীবনটার মাঝে একটুখানি বৈচিত্র্য আনে। বিবাহিত জীবনের সেই যে কটা বছর সে পার হোয়ে এসেছে তার মধ্যেও এমন কিছু পায়-নি যার স্মৃতি আঁকড়ে ধরে সে ভবিষ্যৎ-জীবন কাটাতে পাবে। সে অশোককে ভালবাসত কিন্তু সে স্মৃতি সুখের বদলে দুঃখই বেশী আনে।

যোগমায়া প্রত্যহ ভোরে স্নান কোরে সূর্য্যকে প্রণাম করতে ছাতে যেতেন; অরুণাও তাঁর সঙ্গে যেত। তাদের ছাত থেকে চারিদিকে দেবমন্দিরের চূড়া দেখা যেত। পাষাণ দেবতার চেয়ে দেবতার মন্দিরই তার মনকে বেশী আকর্ষণ করত। ভোরবেলা

বালস্থর্য্যের নবীন কিরণ·চারিদিকে আনন্দের প্রস্রবণ ছুটিয়ে জগতে প্রাণের সাড়া জাগিয়ে তুল্‌ত, কিন্তু অরুণার হৃদয়ে সে কিরণ আনন্দের স্পন্দন জাগাতে পারত না।

অরুণার দিন এম্‌নি ভাবে কেটে যাচ্ছিল, এমন সময় একদিন যোগমায়া তাকে ডেকে বল্লেন—অরুণা কলকাতায় যাবি?

কলকাতা! কলকাতা! অরুণার কানে যেন মধু বর্ষিত হোলো। সেখানে তার কেউ নাই, তাদের যে বাড়ীখানা ছিল তাও বিক্রি হোয়ে গেছে। অরুণা শুনেছিল অন্য লোকে সেখানে নতুন বাড়ী তুলেছে। নিজের ভিটের ওপব মানুষের স্বাভাবিক মমতা থাকে, কিন্তু তার সে মমতার আধারও নাই। কাশীতে বৃদ্ধাদের মুখে কত দিন সে শুনেছে—কাশীতে এলে আব কোথাও যেতে মন চায় না। তবুও কলকাতার নাম শুনে তাব প্রাণটা নেচে উঠ্‌ল। তার মনে হোলো এতদিন ধরে রোজ সকালে উঠে সে যে আকাশেব দিকে চেয়ে থাক্‌ত, আজ সেই মৌন গম্ভীর নীলাকাশ ভেদ কোরে এক ঝলক্ মুক্তির বাতাস যেন তাব গায়ে এসে লাগ্‌ল। সে যোগমায়াকে বল্লে—চল না বড় মা কলকাতায়, এখানে আর থাক্‌তে পার্‌চি না, প্রাণটা হাঁপিয়ে উঠেচে।

যোগমায়া বল্লেন—অশোক তো বরাবরই আমায় যেতে লিখ্‌চে কিন্তু তুই যেতে চাইবি কি না, সেই জন্য কিছু বলি-নি।

অরুণা বল্লে—আমি কেন যেতে চাইব না বড়মা, আমার আর যেতে বাধা কিসের? বৌকে দেখ্‌তে ইচ্ছা করে, কেমন বৌ হোলো—

যোগমায়া বল্লেন—বৌ বড় ভালো রে! বড়লোকের মেয়ে বটে, কিন্তু অমন মেয়ে হয় না। সে তো অরুণার নামে পাগল। চল্ তা হোলে, বৌ-ও দেখ্‌বি—আরও কিছু দেখ্‌বি।

অরুণা উৎসাহিত হোয়ে বল্লে—আর কি দেখ্‌ব বড় মা?

—অশোকের যে ছেলে হয়েছে। ছেলের ভাতের সময় হোলো এবার আর না গেলেই নয়।

নাতি হওয়ার সংবাদ পাওয়া পর্য্যন্ত যোগমায়ার প্রাণটা কলকাতায় পড়েছিল, কিন্তু তিনি সঙ্কোচে অরুণাকে সে কথা এতদিন বল্‌তে পারেন-নি।

অশোক মাকে শুধু সংবাদটাই পাঠিয়েছিল কিন্তু মাধবী প্রায় রোজই শ্বাশুড়ীকে অরুণাকে নিয়ে আস্‌বার জন্য তাগাদা দিতে লাগ্‌ল। মাধবীর খানকয়েক চিঠি পাওয়ার পর যোগমায়া একদিন অরুণার কাছে কথা পাড়্‌লেন। কল্‌কাতায় যেতে অরুণার আপত্তি নেই দেখে তাঁর বুক থেকে মস্ত একটা বোঝা নেমে গেল। তিনি সেই দিনই অশোককে আস্‌বার জন্য চিঠি লিখে দিলেন।

মার চিঠি পেয়ে অশোক মাধবীকে ডেকে বল্লে—আজ তোমায় আমি এমন একটা খবর দিতে পারি যা শুন্‌লে তুমি আমার ওপর এত খুশী হবে যে, এক্ষুনি রেগে ভবানীপুরে চলে যাবে। কিন্তু সে খবর আমি দেব না।

মাধবী অশোকের মুখের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে বল্লে—চাইনে তোমার খবর শুন্‌তে।

মাধবী নীচে চলে গেল বটে, কিন্তু বেশীক্ষণ কাজে মন দিতে পারল না। অশোকের কাছ থেকে সেই খবরটা না শোনা অবধি তার মন কিছুতেই সুস্থির হোতে পার্‌ছিল না। একটু পরেই সে ঘুরে-ফিরে আবার সেই ঘরে এসে উপস্থিত হোলো। মাধবী যে কি কর্‌তে এসেছে তা বুঝ্‌তে পেরে অশোক চুপ কোরে রইল। মাধবী এটা-সেটা নাড়্‌তে-নাড়্‌তে হঠাৎ জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কি বলা হচ্ছিল তখন?

অশোক হাই তুল্‌তে-তুল্‌তে বল্লে—আমার অরুণা যে আস্‌চে।

—ও এই কথা! তা তোমার অরুণাকে আনাচ্ছে কে শুনি? আমিই তো তাকে আস্‌তে লিখেছি।

—তুমি লিখেচ! কেন তোমার এমন বুদ্ধি হোলো বল দিকিন্?

—এই তোমার দুঃখ দেখে।

মাধবী যে শ্বাশুড়ীকে আস্‌বার জন্য তাগাদা দিচ্ছিল সে কথা সে অশোককে জানায়-নি। সে বল্লে—খোকা হওয়া পর্য্যন্ত মাকে আস্‌বার জন্য লিখ্‌চি, তা এই ছ-মাস পরে আস্‌বার মন হয়েছে।

অশোক বল্লে—আমায় গিয়ে যে মাকে নিয়ে আস্‌তে হবে।

মাধবী বল্লে—সে কি! তুমি কি কোরে যাবে?

—কেন ট্রেণে চড়ে!

—আরে না না আমি তা বল্‌চি না।. তোমার সব তাতেই চালাকি। আমি বল্‌চি এখানে তা হোলে থাক্‌বে কে?

অশোক বল্লে—কেন? বাড়ীতে ঝি, চাকর, দারোয়ান সবাই রইল।

—তার চেয়ে এক কাজ কর না। আমি আমাদের পুরোনো সরকার মশায়কে এখানে আস্‌তে লিখে দিই, তিনি গিয়ে মাকে কাশী থেকে নিয়ে আসুন।

কথাটা বলেই মাধবীর ভয় হোলো পাছে অশোক তার প্রস্তাব শুনে মনে করে যে সে তার কাছে জমিদারী ফলাচ্চে। মাধবীর পিতার অর্থ তাদের সাংসারিক জীবনে প্রায়ই এমনি খুঁটিনাটির ভেতর দিয়ে ঢুকে গোল বাধাত। সে তখুনি আবার বল্লে—না না তুমিই যাও, বাড়ীতে সবাই রইল।

মাধবীর অবস্থা দেখে অশোকের হাসি পেল। সে বল্লে —হ্যাঁ আমিই যাই মাধবী। মা তোমাদের সরকারকে চেনেন না, তার ওপর তিনি বুড়ো মানুষ সব সাম্‌লাতে পারবেন না। আমার যেতে-আস্‌তে দিন সাতেকের বেশী দেরী হবে না।

পরদিন রাত্রে অশোক মাকে আন্‌তে কাশী চলে গেল।

দিন পাঁচেক পরে একদিন সকালে অশোক তার মা ও অরুণাকে নিয়ে কলকাতায় ফিরে এল। মাধবী তখন ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে উঠোনে দাঁড়িয়ে পাচক ঠাকুরকে রান্না সম্বন্ধে কি উপদেশ দিচ্ছিল এমন সময় যোগমায়া ভেতর-বাড়ীর দরজা

পেরিয়ে উঠোনে প্রবেশ করলেন। মাধবীকে দেখেই তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কৈ, আমার নাতি কোথায়?

মাধবী শ্বাশুড়ীকে প্রণাম করতে-করতে বল্লে—ওপরে ঘুমুচ্ছে।

যোগমায়া তখুনি সেখান থেকে ওপরে চলে গেলেন। অরুণা যোগমায়ার ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। মাধবী শ্বাশুড়ীকে প্রণাম কোরে মাথা তুলতেই তার চোখ দুটো অরুণার চোখের ওপর পড়ল। নাতিকে দেখবার আগ্রহে মাধবীর সঙ্গে যে অরুণার পরিচয় নাই সে কথা যোগমায়া একেবারে ভুলেই গিয়েছিলেন।

অরুণা আর মাধবী নির্ব্বাক হোয়ে উভয়ে উভয়ের দিক চেয়ে রইল। মাধবী অরুণাকে কি সম্পর্কে আহ্বান করবে, তাকে প্রণাম করবে কি না তা সে ঠিক করতে পারছিল না। অরুণার অবস্থাও ঠিক সেই রকমের। মাধবী সম্পর্কে তার কে হোলো, যদি সে সম্পর্কে তার বৌ-দি হয় তবে তাকে প্রণাম করতে হবে। কিন্তু মাধবী তার চেয়ে বয়সে ছোট। তাকে প্রণাম করার চাইতে ছোট বোনের মত বুকে জড়িয়ে ধরতেই তার ইচ্ছা করছিল। কিন্তু অশোকের স্ত্রীর সঙ্গে বোন সম্পর্ক পাতান যোগমায়া বা অশোক কি ভাবে গ্রহণ করবে তা সে বুঝতে পারছিল না। তারা দুজনেই দুজনের মুখের দিকে চেয়ে আছে এমন সময় অশোক বাড়ীর ভেতর আসতেই অরুণা যেন বেঁচে গেল। সে আস্তে-আস্তে সেখান থেকে সরে একেবারে ছাতের ওপরে উঠে গেল।

ছাতে গিয়ে অরুণা প্রথমেই তাদের বাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল। তাদের সে ভাঙা-বাড়ী আর নেই। যারা সে বাড়ী কিনেছিল তারা পুরোনো বাড়ী ভেঙে ফেলে সেখানে একেবারে নতুন বাড়ী তৈরী করেছে। ছাতের পাঁচিলের ধারে দাঁড়িয়ে অরুণা অনিমেষ নয়নে সেই ঝক্‌ঝকে বাড়ীটার দিকে চেয়ে রইল। ঐ তাদের ভিটে ছিল, ঐ তার শৈশবের লীলাভূমি। অরুণার হারিয়ে যাওয়া শৈশব তার চেতনার অগোচরে ধীরে ধীরে স্মৃতিপটে প্রতিফলিত হোতে লাগ্‌ল। ছেলেবেলার খেলা-ধুলা, বাবা মার আদর, বাবার মৃত্যু! মনে পড়্‌ল অশোক ও যোগমায়ার আদর—আরো কত কথা। আজ যেখানে দাঁড়িয়ে সে জীবনের হারানো দিনগুলোর কথা ভাব্‌চে, এই স্থানই তো তার জীবনে নির্দ্দিষ্ট ছিল। কতদিন সে ভেবেচে এইখানে দাঁড়িয়ে সে মার সঙ্গে গল্প কর্‌বে। অশ্রুজলে অরুণার চোখ দুটো ঝাপ্‌সা হোয়ে এল। সে আঁচলের খোঁট দিয়ে চোখ মুছে ফেল্লে।

পাশের বাড়ীর ছাতে একটী ছোট্ট ফুট্‌ফুটে ছেলে এসে দাঁড়াল। অরুণাকে দেখ্‌তে পেয়ে ছেলেটি এগিয়ে এসে তার দিকে অবাক হোয়ে চেয়ে রইল। সুন্দর সেই নধর ছেলেটাকে একবার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধর্‌বার জন্য অরুণার প্রাণটা উদ্বেল হোয়ে উঠ্‌ল। সে তাকে জিজ্ঞাসা করলে—খোকা তোমার নাম কি?

খোকা তার অত্যন্ত পরিচিত জায়গায় একজন অপরিচিতাকে

দেখে আশ্চর্য্য হোয়ে গিয়েছিল। সে অরুণার প্রশ্ন শুনে একটু পিছিয়ে গেল মাত্র, কোনো জবাব দিলে না। অরুণা আবার তাকে প্রশ্ন কর্‌লে—খোকা তুমি আমাদের বাড়ীতে আস্‌বে?

খোকা এবার ছোট্ট একটি প্রশ্ন কর্‌লে—তুমি কে?

অরুণার মনে হোলো—তাইত, আমি কে? আমি এদের বাড়ীতে এসেছি অনাহূত। এ বাড়ীতে কারুকে ডাকবার আমার কি অধিকার! একবার তার মনে হোলো ছেলেটাকে ডেকে বলি—ওরে খোকা, ওবে সোনা ঐ যে বাড়ীর ছাতে তুই দাঁড়িয়ে আচিস্‌, ঐখানে আমার বাড়ী ছিল। তোর মতন আমিও একদিন ওখানে খেলে বেড়িয়েছি। অরুণার গাল বয়ে ঝর্‌ ঝর্‌ কোরে অশ্রু গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। সে আঁচল দিয়ে চোখ মুচ্‌ছিল এমন সময় পেছন থেকে কে দুখানা নরম হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধর্‌লে। অরুণা চম্‌কে পেছনে ফিরে দেখ্‌লে মাধবী তাকে জড়িয়ে ধরেছে।

অরুণা পেছনে ফিরতেই মাধবী তাকে বল্লে—তোমায় আমি কি বলে ডাক্‌ব ভাই?

মাধবীর আলিঙ্গনে অরুণার থতোমতো লেগে গিয়েছিল। তার প্রশ্নের যে কি জবাব দেবে তা সে ঠিক কর্‌তে পারছিল না। তার মনে হোতে লাগ্‌ল—ছি ছি মাধবী তাকে কাঁদতে দেখে ফেলেছে।

অরুণাকে চুপ কোরে থাক্‌তে দেখে মাধবী আবার প্রশ্ন কর্‌লে—হ্যাঁ ভাই, তুমি কি আমার ওপর রাগ করেছ?

এবার অরুণা বল্লে—না ভাই, শুধু-শুধু তোমার ওপর রাগ কর্‌ব কেন?

—তবে! আমি তোমায় কি বলে ডাক্‌ব বল্লে না?

বল্লে—আমায়? আমি তোমার দিদি—

মাধবী বল্লে—তা হোলে ছোট বোনটীর প্রণাম নাও।

অরুণাকে প্রণাম কোরে মাধবী জিজ্ঞাসা কর্‌লে—এখানে এমন কোরে একলাটি দাঁড়িয়ে কেন দিদি?

অরুণা বল্লে—ঐ যে বাড়ীটা দেখ্‌চ, ঐখানে আমাদের বাড়ী ছিল—

অরুণা আর বল্‌তে পার্‌লে না। তার গলার স্বর ধরে এল। সে আঁচলের খোঁট তুলে চোখে দেওয়া-মাত্র মাধবী তাকে সেখান থেকে সিঁড়ির দরজার কাছে নিয়ে এসে বল্লে—আমার ছেলে দেখ্‌বে না দিদি?

অরুণা বল্লে—দেখ্‌ব বৈ কি! চল দেখি গিয়ে।

মাধবী অরুণাকে একেবরে শোবার ঘরে টেনে নিয়ে গেল। যোগমায়া নাতিকে কোলে নিয়ে ছেলের সঙ্গে গল্প কর্‌ছিলেন। মাধবী সন্তর্পণে ঘুমন্ত শিশুকে শ্বাশুড়ীর কোল থেকে তুলে নিয়ে অরুণার কোলে দিল। খোকাকে কোলে নিয়ে অরুণা মাধবীকে আস্তে-আস্তে বল্লে—বড় সুন্দর দেখ্‌তে হয়েছে।

সন্তানের রূপের প্রশংসা শুনে মাধবীর মাতৃহৃদয় গলে গেল। সে অরুণাকে আবার জিজ্ঞাসা কর্‌লে—সুন্দর হয়েছে?

অরুণা বল্লে—ভারি সুন্দর হয়েছে। হবেই না বা কেন, কেমন সুন্দর মা।

মাধবী একটা রসিকতা কব্‌তে যাচ্ছিল, কিন্তু তখুনি নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে অরুণাকে বল্লে—দিদি এবার তোমরা নেয়ে খেয়ে শুয়ে পড়, কাল সারারাত তো ঘুমুতে পার-নি।

মাধবী অরুণার কোল থেকে ছেলেকে নিয়ে আবার যথাস্থানে শুইয়ে রেখে তাকে স্নানের জায়গায় নিয়ে চল্‌ল।

অরুণার সহস্র আপত্তি সত্বেও মাধবী তাকে বসিযে তার রুক্ষ মাথায় তেল মাথিয়ে দিতে লাগ্‌ল। উপায়ান্তর না দেখে অরুণা চুপ্ কোরে মাধবীর এই আদর সহ্য করতে লাগ্‌ল। একটু পবে মাধবী বল্লে—ছেলে তোমার পছন্দ হয়েছে দিদি ?

অরুণা বল্লে—অমন সুন্দর ছেলে কাব না পছন্দ হয় ?

মাধবী আবার একটু চুপ কোরে বল্লে—দিদি, একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব ঠিক বল্‌বে ?

অরুণার বুকের মধ্যে ছাঁৎ কোরে উঠ্‌ল। তার সমস্ত শিরায় রক্ত কণিকাগুলো যেন ছোট-ছোট হাত-পা বের কোরে কিল্‌বিল্ কোরে বেড়াতে আরম্ভ কোরে দিলে। কি কথা! এই সত্যপরিচিতা তাকে কি কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে চায়! সেই কথা নয় তো ?

সে মাথার ওপর থেকে মাধবীর হাতখানা ধরে টেনে তাকে সাম্‌নে নিয়ে এসে দেখ্‌লে যে, তার বিশাল দুই নয়নের কোনে দু-ফোঁটা অশ্রু টল্‌মল্ কর্‌ছে। মাধবীর চোখে জল দেখে অরুণা

অবাক হোয়ে তার মুখের পানে চেয়ে রইল। কোনো প্রশ্ন তার মুখ থেকে বেরুল না।

মাধবী আবার বল্লে—বল দিদি, আমি যা জিজ্ঞাসা করব ঠিক কোরে বল্‌বে।

অরুণা হেসে বল্লে—বা রে! প্রশ্ন না শুনেই কি কোরে বল্‌ব?

মাধবী বল্লে—বল, আমার ওপর তোমার কোনো রাগ নেই। আমার কোনো দোষ নেই দিদি—

মাধবীর এই কথাগুলোর মধ্যে অরুণার জীবনের সমস্ত ইতিহাস গোপন ছিল। সে কোনো উত্তর দিতে পারলে না, চুপ কোরে অনড় হোয়ে বসে রইল।

মাধবী আবার বল্লে—আমি জানি, আমি সব শুনেছি।

অরুণা বাষ্পরুদ্ধ-স্বরে বল্লে—কি শুনেছ?

মাধবী বল্লে—এই বাড়ী, ঘর, এই সুখ—আমি যা-কিছু ভোগ কর্‌চি এ সবই তোমার প্রাপ্য ছিল। আমি উড়ে এসে জুড়ে বসেচি।

অরুণা একটু হাসবার চেষ্টা কোরে মাধবীর মাথাটা নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে এসে বল্লে—পাগ্‌লী, কে তোকে এ সব কথা বল্লে?

মাধবী কোলের মধ্যে থেকে মাথা না তুলে অস্ফুটস্বরে বল্লে—যে বল্‌তে পারে—

মাধবীর কথায় অরুণার সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে পুলকের একটা মৃদু শিহরণ

খেলে গেল। তাব এতদিনের পুঞ্জীভূত বেদনা—যার ব্যথায় জীবন তার বৃথা, সেই ব্যথার ওপরে কে যেন শীতল পেলব পরশ বুলিয়ে দিলে। বুকের ভিতরকার চিরমৌন কোকিল ডানা ঝাড়া দিয়ে একবার অস্ফুট কাকলী কোরে আবার নীরব হোয়ে গেল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। এই মুহূর্ত্তটা কেটে যাওয়ার পর অরুণা মাধবীর মাথায় হাত বুলিয়ে বল্লে—সে জন্য তোমার ওপর রাগ করব কেন ভাই! তুমি যে আমার ছোট বোন।

মাধবী এবার তাড়াতাড়ি উঠে স্নানের ঘব থেকে বেরিযে এল। সে বলে গেল—চট্‌পট্‌ স্নান সেবে নাও, আমি তোমাদের খাবাব কতদূর কি হোলো দেখ্‌তে চল্লুম।

কলকাতায় এসে অরুণা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচ্‌ল। কলকাতার দূষিত বাতাস, সন্ধ্যার ধোঁয়া, পিঞ্জরের মতন বাড়ী, প্রতি ঋতুতেই মহামারী ইত্যাদি আরও সহস্র আপদের মধ্যেও সে এমন একটা কিছু পেলে যা এতদিন নিত্যোৎসবময়ী বারাণসীর মঠ, মন্দির, দেউল তাকে দিতে পারে-নি।

অরুণার যাতে কোনো রকমের অসুবিধা না হয় অশোক ও মাধবী দুজনেরই সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। অরুণাও বুঝতে পেরেছিল যে এই ঘরই তার জীবনে নির্দ্দিষ্ট হোলো এবং এখানে যে সে সারাজীবন বেশ কাটাতে পার্‌বে সে বিষয়েও তার কোনো সন্দেহ ছিল না। মাধবী ধীরে-ধীরে সংসারের কর্ত্রীত্বের ভার অরুণার ওপরে ছেড়ে দিতে লাগ্‌ল, অরুণাও অত্যন্ত সহজভাবে সেই ভার গ্রহণ কর্‌তে লাগ্‌ল, যেন এই সংসারের সমস্ত দায়িত্ব চিরদিন তার ওপরেই ন্যস্ত ছিল।

কাশীতে যেমন তার কোনো কাজই ছিল না, এখানে তেমনি সব কাজেরই চাপ তার ওপরে পড়্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু সকাল থেকে আরম্ভ কোরে রাত্রি দশটা অবধি নানা কাজে ব্যস্ত থেকেও অরুণার মনের খানিকটা জায়গা খালি পড়ে থাক্‌তে লাগ্‌ল। কোনো কাজ দিয়েই সে সেই জায়গাটুকু ভরাতে পারলে না।

অরুণার হৃদয়ের এই যে অনুভূতি ও ক্ষুধা কিসের সে কথা নিয়ে সে মাঝে-মাঝে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া কর্‌ত। সে পিতৃ-মাতৃহীন, কিন্তু পিতামাতা চিরদিন কারুরই থাকে না। বরং এ বিষয়ে সে সৌভাগ্যবতী, কারণ যোগমায়া ও মাধবী:' স্নেহে যত্নে এদিক দিয়ে তার কোনো দুঃখ নাই। স্বামীর ঘরে দারিদ্র্য দুঃখ কিছুকাল তাকে সহ্য করতে হযেছিল, কিন্তু উদবান্নের জন্য সেই যে ভাবনা, সে ভাবনাও ঘুচে গেছে। ভাবতে-ভাবতে তার মনে হোতো—হায় রে! উদরের অন্ন সংসারে নিত্য মেলে কিন্তু হৃদয়-ক্ষুধার অন্ন পৃথিবীতে দুর্ল্লভ।

অরুণাকে অশোকেব সংসারে প্রতিষ্ঠিত দেখে যোগমায়া নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি দেখ্‌লেন যে, তাঁর বৌমার চেয়ে অরুণা তাঁদের সংসারকে ভালো কোরে গুছিযে তুল্লে, দেখ্‌লেন যে কাজ কেউ করে না অরুণা নিজেব চাড়ে সে কাজের ভার মাথায় তুলে নেয়! সমস্ত খুঁটিনাটি পর্য্যন্ত তাব নখদর্পণে। সে হাসে, গল্প করে, উৎসাহ কোবে জিনিষ কেনে। কিন্তু সমস্ত কাজের বাইরে যা পড়ে রইল সেটুকু দেখ্‌বার মত দৃষ্টি তাঁর আর ছিল না।

অরুণাকে নিজের সংসারে নিয়ে এসে তাকে সুখে রাখ্‌বার ইচ্ছা অশোকের অনেকদিন থেকেই ছিল। কিন্তু সে কথা অরুণাকে এতদিন কিছুতেই সে বল্‌তে পারে-নি। এ বিষয়ে তার মনে বরাবরই একটা দ্বিধা ছিল। অরুণার মার ইচ্ছা অনুসারে সে যে তখন অরুণাকে বিয়ে করে-নি, এজন্য সে মনে-মনে লজ্জিত ছিল এবং সে-ই যে অরুণার দুর্দ্দশার কারণ সে কথা অশোক

মনে-মনে স্বীকার করত। এই সঙ্গে সে এ কথাও স্বীকার করত যে অরুণার প্রতি তার একটা কর্ত্তব্য আছে।

অশোক ও অরুণা দুজনেই দুজনকে ভালবাস্ত। অরুণার প্রতি অশোকের যে ভালবাসা মাধবী তার প্রেম দিয়ে তার ওপরে একটা আবরণ দিয়ে দিয়েছিল। ভেতরে যাই থাক না কেন সে দুর্ভেদ্য আবরণ ভেদ কোরে সেখানকার কোনো সংবাদ বাইরের জগতে আস্তে পেত না। নিজের সম্বন্ধে অশোক নিশ্চিন্ত ছিল কিন্তু অরুণা সম্বন্ধে তার মনে একটা সন্দেহ ছিল। সে তার স্ত্রীকে নিয়ে অরুণার চোখের সাম্নে সুখে ঘরকন্না কর্বে, তাদের সেই সুখ যদি অরুণার মনে পুরোনো স্মৃতি জাগিয়ে তোলে এই আশঙ্কায় সে তাকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আস্তে সঙ্কুচিত হোতো। অরুণা তার কাছে আসবার পর অশোক লক্ষ্য কোরে দেখলে যে, পূর্ব্বস্মৃতি তাকে বিচলিত করে না—তখন সে-ও যেন নিশ্চিন্ত হোলো।

অরুণা সম্বন্ধে সকলেই নিশ্চিন্ত হোলো বটে, কিন্তু নিশ্চিন্ত হোতে পারলে না, কেবল একজন—সে মাধবী। অরুণার যে দুঃখ তার জন্য মাধবী মোটেই দায়ী নয়। কিন্তু তবুও তার মনে হোতো, এই যে সুখ আজ সে ভোগ করচে এ সৌভাগ্য অরুণারই প্রাপ্য ছিল। এই জন্য সে শুধু অরুণার মুখের হাসি ও বাইরের ব্যবহার দেখে সন্তুষ্ট হোতে পারলে না। সে মধ্যে মধ্যে অরুণার মনের মধ্যে প্রবেশ করবার চেষ্টা করত। অরুণার অন্তরে কোনো ক্ষোভ আছে কিনা তা জানবার জন্য তাকে বেশী

চেষ্টা করতে হোতো না; যে দৃষ্টি পরের দুঃখ অতি সহজেই দেখতে পায় মাধবীর সে দৃষ্টি ছিল; সামান্য চেষ্টাতেই সে সব বুঝতে পারত বলেই তার সুখের যতখানি সম্ভব অংশ সে অরুণাকে দেবার চেষ্টা করত।

একদিন দুদিন কোরে অশোকদের বাড়ীতে অরুণার দু-বছর কেটে গেল। অশোকদের সুখ-দুঃখ ক্রমে তারও সুখ-দুঃখে পরিণত হোলো।

পৌষ মাস। অরুণা ভোরে স্নান কোরে কিছুক্ষণ ছাতে গিয়ে চুল শুকোয়। সেদিন সে ছাতে দাঁড়িয়ে চুল শুকোচ্ছে এমন সময় মাধবী তার ছেলেকে নিয়ে ছাতে গিয়ে উপস্থিত হোলো। মাধবী দেখলে, অরুণা একমনে তাদের বাড়ীটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে অরুণার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—ও দিকে কি দেখ্‌চ দিদি?

অরুণা বল্লে—দেখ্‌ ওদের বাড়ীর ছেলেটা কি সুন্দর! ওকে আমি ডাকৃচি তা ও গ্রাহ্যই করে না। ছেলেগুলো কিছু বোঝে না।

মাধবী বল্লে—ছেলের ভাবনা কি দিদি? তোমার এমন সুন্দর ছেলে রয়েছে। তুমি পরের ছেলে নেবার জন্য অত ব্যস্ত কেন?

মাধবী অরুণার কোলে তার ছেলেকে দিয়ে বল্লে—এ ছেলে কি তোমার পর দিদি?

অরুণা উচ্ছ্বসিত মাতৃস্নেহের আবেগে মাধবীর ছেলেকে কোলের

মধ্যে জড়িয়ে ধরে তার কপালে চুমু খেয়ে বল্লে—না রে না, এর চাইতে আপনার আর আমার কি আছে ?

মাধবী বল্লে—দিদি ও ছেলে তোমার, ওর ভার তোমার ওপর।

অরুণা হাস্‌তে-হাস্‌তে বল্লে—আমার ওপর আর কত ভার চাপাবি মাধবী ?

মাধবীও হাস্‌তে-হাস্‌তে বল্লে—যতখানি সয়, তার বেশী নয়। এই বলে সে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল।

সেইদিন থেকে অরুণার ওপর খোকার ভার পড়্‌ল। তাকে নাওয়ানো, খাওয়ানো, ঘুম-পাড়ান—এমন কি রাত্রে তাকে নিয়ে শোয়া পর্য্যন্ত! অরুণা দেখ্‌লে সংসারশুদ্ধ তাকে যা দিতে পারে-নি এই এক ফোঁটা স্বর্গের দূত তাকে সেই শান্তি এনে দিলে। তার অন্তরের সমস্ত ক্ষুধা মাতৃস্নেহের ধারায় পরিণত হোলো।

———

যোগমায়া দিনরাত পূজো অর্চ্চনা নিয়ে পড়লেন। প্রথম জীবনে স্বামীর সঙ্গে তাঁর দারিদ্রে দিন কাট্‌ত বটে কিন্তু মনের অশান্তি ভোগ করতে হয়-নি। স্বামীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে অশোক মানুষ হোতেই তাঁব দারিদ্র্য-দুঃখ আর ছিল না, কিন্তু অরুণাকে নিয়ে তিনি অত্যন্ত মনোকষ্টে দিন কাটাচ্ছিলেন। অরুণা অশোকের কাছে এসে থাকায় তিনি নিশ্চিন্তমনে দেবতার কাছে নিজেকে অর্পণ করলেন।

অরুণা কলকাতায় এসে তার সমস্ত মন প্রাণ অশোকের সংসার ও তার ছেলের ওপরে ঢেলে দিলে। অরুণাকে দেখে মাধবী মহা উৎসাহে সংসারের কাজে লেগে গেল। তার স্বামী, অরুণা, ছেলে ও শাশুড়ীব সেবা ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থায় সকাল থেকে রাত বারোটা অবধি তার চিন্তার আর অন্ত রইল না। তার মার মতন সে-ও নিজে একটা পাকা গিন্নি হোয়ে ওঠবার জন্ত যেন দস্তরমতন কসরৎ সুরু কল্লে। মাঝখান থেকে ফাঁকে পড়ে গেল অশোক।

এতদিন ধরে মাধবীকে অত্যন্ত একান্তরূপে পেয়ে অশোকের জীবন সেই ভাবেই অভ্যস্ত হোয়ে উঠেছিল। কিন্তু কোনো রকম

ইঙ্গিত না দিয়ে মাধবী এই ভাবে নিজেকে সংসারের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ায় অশোকের প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

অশোক প্রথমে মনে করেছিল মাধবী নিজের সংসার গুছিয়ে নিয়ে আবার তাকে তেমনি ভাবে ধরা দেবে, কিন্তু সে দেখলে যত দিন যাচ্ছে মাধবী যেন ততই তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হোয়ে সংসারের অত্যন্ত অনাবশ্যক কাজগুলোর মধ্যে ছড়িয়ে পড়্‌ছে।

সকালবেলা অশোক বৈঠকখানায় মক্কেলদের সঙ্গে দেখা কর্‌তে যেত। সেখান থেকে বাড়ীর ভেতরে এলে আগে মাধবী ছুটে আস্‌ত। সমস্ত দিন যে তাকে একলা ফেলে অশোক কাছারীতে বসে থাকে এজন্য তার অনুযোগের অন্ত ছিল না। কাছারী থেকে ফিরে আসার পর তার বাহুলতার আবেষ্টনে অশোকের যে মাদকতা আস্‌ত—হঠাৎ সেই মৌতাতের অভাবে সংসারের সমস্ত সুখই অশোকের কাছে নষ্ট হোয়ে যেতে লাগ্‌ল।

কেমন কোরে মাধবী নিজেকে তার কাছ থেকে এমন বিচ্ছিন্ন রাখতে পাবে অশোক তা কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারছিল না। দিন কয়েক তার ভয়ানক অভিমান হোলো।

একদিন রাত্রে মাধবী ঘরে আসার পর অশোক তার সঙ্গে কোনো কথা না বলে চুপ কোরে শুয়ে রইল। কিন্তু সে দেখ্‌লে যে মাধবী অত্যন্ত অবহেলায় তার এই ফাঁদ কাটিয়ে নিশ্চিন্তমনে শুয়ে পড়্‌ল। অশোক চোখ বুঁজিয়ে ভাবতে লাগ্‌ল—এখুনি মাধবীর একখানা হাত তার গায়ে এসে পড়্‌বে, তাকে সে কথা

বলাবার চেষ্টা করবে—কিন্তু তার সমস্ত আশাই বৃথা হোলো। অনেকক্ষণ সেই ভাবে পড়ে থাকার পর সে চোখ চেয়ে দেখ্‌লে, মাধবীর তখন অগাধ নিদ্রা। অশোক তার অভিমানে এই ভাবে আঘাত পেয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে খোলা জানলার ধারে গিয়ে বসে রইল। ঘণ্টা-দুয়েক সেই ভাবে বসে থেকে আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়্‌ল।

পরদিনও অশোক মাধবীর সঙ্গে কোনো কথা বল্লে না। সে নেয়ে-খেয়ে কাছারী চলে গেল, কিন্তু মাধবীর কোনো রকম ভাব বিপর্য্যয় হোলো না, শেষকালে সে হাল্ল ছেড়ে দিলে।

এমনি ভাবে অশোকের দিন কাট্‌ছিল, এই সময় একদিন বেলা থাক্‌তে-থাক্‌তে জ্বর নিয়ে সে কাছারী থেকে ফিরে এল। সেদিন সকাল থেকেই তার জ্বর-জ্বর ভাব হয়েছিল। অন্য সময় হোলে মাধবীকে সে কথা সকালেই বল্‌ত, কিন্তু তা না কোরে সে সেই শরীরেই স্নান কোরে খেয়ে কাছারী চলে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে গিয়ে শরীব অত্যন্ত খারাপ লাগায় সে বাড়ী ফিরে এল।

অশোক মনে করেছিল যে, সে দুপুরবেলা বাড়ীতে ফিরে এলে মাধবী নিশ্চয়ই তার কাছে এসে বস্‌বে আর এতদিন ধরে তার মনে যে অভিমানের বোঝা সঞ্চিত হোয়ে আছে তা সব তার কাছে নামিয়ে দেবে।

মনের মধ্যে নানারকম কল্পনা নিয়ে সে সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তে শুন্‌তে পেলে মাধবী ও অরুণা পাশের ঘরে খুব উৎসাহের

সঙ্গে কি পরামর্শ করচে। সে সেখানে না দাঁড়িয়ে নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে ডাক দিলে—মাধবী!

অসময়ে এই রকম অপ্রত্যাশিত ভাবে অশোকের ডাক শুনে মাধবী সেখান থেকে উঠে নিজের ঘরে গেল। অশোককে দেখে সে জিজ্ঞাসা করলে—কি গো এত শীগ্‌গীর যে?

মাধবী এসে অশোকের কপালে হাত দিয়ে দেখ্‌লে সামান্য গরম। সে অশোকের হাত ধরে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিয়ে বল্লে—তুমি শোও আমি এখুনি আস্‌চি।

ভবানীপুরে মাধবীর এক সই থাকৃত। অনেকদিন থেকেই মাধবীর তাকে নেমন্তন্ন করবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু এত দিন তা হোয়ে ওঠে-নি। সেদিন এক জায়গায় অনেকদিন পরে দুই সখীতে দেখা হওয়ায় মাধবী আগামী কাল তাকে তাদের বাড়ীতে আসবার জন্য নেমন্তন্ন করেছিল। সইকে কি খাওয়ান হবে, কি উপহার দেওয়া হবে আজ দুপুরে অরুণার সঙ্গে বসে মাধবী সেই পরামর্শে ব্যস্ত এমন সময় সে অশোকের ডাক শুন্‌তে পেলে। অশোককে শুইয়ে রেখে মাধবী তখুনি আবার অরুণার ঘরে ফিরে এল। তাদের পরামর্শ তখনো শেষ হয়-নি।

মাধবীকে কি বল্‌তে হবে অশোক বিছানায় পড়ে মনে-মনে সেই কথাগুলো শানাতে লাগ্‌ল। ওদিকে পনেরো মিনিট, আধঘণ্টা, ক্রমে এক ঘণ্টা কেটে গেল, কিন্তু মাধবীর দেখা নেই। অশোক একবার বিছানা ছেড়ে উঠে অরুণার ঘরের দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল। মাধবী তখন মহা উৎসাহে

ফর্দ্দ করছিল, অশোক খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এসে আবার শুয়ে পড়্‌ল। ক্রমে আরও এক ঘণ্টা কেটে গেল, কিন্তু মাধবীর তখনো দেখা নেই, শেষকালে মাধবীর ফিরে-আসা সম্বন্ধে হতাশ হোয়ে অশোক ঘুমোবার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল।

অশোকের যখন ঘুম ভাঙ্‌ল তখন সন্ধ্যা উৎরে গিয়েছে। সে দেখ্‌লে যে, ঘরের মধ্যে আলো জ্বালান হয়েছে। অশোক একবার চোখ চেয়ে আবার চোখ বন্ধ কোরে পড়ে রইল। দারুণ অবসাদে তার দেহমন অবসন্ন হোয়ে পড়েছিল, সেই অবসন্নতায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিলে।

অরুণা কি কর্‌তে ঘরের মধ্যে এসে অশোককে ও-রকম ভাবে শুয়ে থাক্‌তে দেখে জিজ্ঞাসা করলে—সন্ধ্যাবেলা ঘুমুচ্ছ কেন?

অশোক বল্লে—ঘুমুই-নি তো!

—তবে! চোখ বুঁজিযে কার মূর্ত্তি ধ্যান করা হচ্ছে—পাঠিযে দেব?

অশোক একটু চুপ কোরে থেকে বল্লে—তুমি আমার কাছে একটু বস না!

অশোকের এই অপ্রত্যাশিত আহ্বানে অরুণার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হোয়ে উঠ্‌ল। ছুটে সেখান থেকে পালিয়ে যাবার ইচ্ছায় একবার সে দরজার দিকে মুখ ফেরালে, কিন্তু কিছুতেই সে ঘর

থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে না। মৃদু পদক্ষেপে এগিয়ে সে অশোকের পাশে বসে পড়্‌ল।

অশোক অরুণার মুখের দিকে চাইতেই সে তাকে বল্লে—শরীর কি বড্ড খারাপ লাগ্‌চে? মাথা টিপে দেব?

অশোক বল্লে—দাও।

অরুণা আস্তে-আস্তে অশোকের মাথা টিপে দিতে আরম্ভ করলে। আশাক একবার—আঃ—বলে চোখ দুটো বুঁজিয়ে ফেল্লে।

অরুণার বুকের মধ্যে তখন প্রলয়ের তাণ্ডব চলেছিল। সে প্রাণপণে নিজের এই দুর্ব্বলতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগ্‌ল।

অরুণার হাতের স্পর্শে অশোকের ঘুম আস্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু একটু পরেই সে বুঝতে পারলে যে তার হাতখানা কাঁপ্‌চে, সে তাকে মুক্তি দেবার জন্য বল্লে—আমায় এক কাপ চা খাওয়াতে পার অরুণা?—বেশ আদা দিযে।

অরুণা যেন বেঁচে গেল, সে তখুনি উঠে বল্লে——আচ্ছা চা পাঠিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু সন্ধ্যেব সময় ঘুমিও-না।

অরুণার শরীর ও মন কিসের একটা নেশায় বিহ্বল হোয়ে পড়েছিল। অশোকের ঘর থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ অন্ধকারে চুপ কোরে দাঁড়িয়ে থেকে সে সোজা রান্না ঘরে চলে গেল।

রান্নাঘরের এক কোনে যোগমায়া নাতিকে কোলে নিয়ে জপমালা ঘুরিয়ে বন্ধণের মাঝে মুক্তির স্বাদ পাবার চেষ্টা করছিলেন। মাধবী ঠাকুরের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বল্‌ছিল—কাল বাইরে আর একটা উনুন করতে হবে—এমন সময় অরুণা সেখানে

এসে তাকে বল্লে—পোড়ারমুখী সকাল থেকেই যে সুরু হয়েছে এখনো শেষ হোলো না? যাও না একটু কাছে গিয়ে বোসো না গিয়ে—

ঘরের মধ্যে যে যোগমায়া বসে আছেন অরুণা তা একেবারেই লক্ষ্য করে-নি। মাধবী অবাক হোয়ে অরুণার মুখের দিকে চেয়ে রইল। হঠাৎ তার ভাবান্তরের কোনো কারণ সে অনুমান করতে পারলে না।

অরুণা আবার বল্লে—আবার ন্যাকার মত মুখের দিকে হাঁ কোরে চেয়ে রইলি যে? জ্বর নিয়ে এসেছ না? যা ঘরে!

মাধবী আর বাক্যব্যয় না কোরে রান্নাঘর থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। যোগমায়ার সাম্‌নে অরুণা তাকে ঐ ভাবে ধমক দেওয়ায় সে অপ্রস্তুত তো হয়েইছিল, সঙ্গে-সঙ্গে রাগও কম হয়-নি। সে ভাব্‌তে ভাব্‌তে লাগ্‌ল—দিদির সে কি একটুও আক্কেল নেই? মার সাম্‌নে ঐ কথাগুলো কি কোরে সে বল্লে! মা হয়তো মনে কর্‌লেন তাঁর ছেলেকে আমি অযত্ন করি। মাধবীর মনে পড়্‌ল অশোক বাড়ীতে এসেই তাকে ডেকেছিল, কিন্তু তখন কালকের নেমন্তন্নর ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত ছিল বলে তার কাছে গিয়ে বস্‌তে পারে-নি। হিসাব-পত্রের হাঙ্গামা চুকিয়ে ঘরে গিয়ে অশোককে ঘুমুতে দেখে সে চলে এসেছিল। একটু জ্বর হয়েছে বলে কি সব কাজকর্ম্ম ফেলে দিনরাত কাছে বসে থাক্‌তে হবে? এই নিয়ে আবার দিদির কাছে লাগান্ হয়েছে। মাধবী ঠিক কোরে ফেল্লে যে, অশোক নিশ্চয় তার

সম্বন্ধে অরুণাকে কিছু বলেছে। সে মনের মধ্যে একটা বিরাট অভিমানের বোঝা নিয়ে আশোকের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

অশোক অরুণাকে চা আন্‌তে বলে তাক্‌ থেকে একখানা বই পেড়ে নিয়ে পড়্‌ছিল। মাধবী কাছে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝ্‌তে পেরেও সে বই থেকে মুখ না তুলে পড়ে যেতে লাগ্‌ল।

মাধবী একটু দাঁড়িয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলে—ডাকা হচ্ছিল কেন?

অশোক কোনো জবাব দিলে না। মাধবী তাঁর ভাবভঙ্গী দেখে ক্রমেই রেগে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা কোরে সে বল্লে—ডাক্‌ছিলে কেন? তোমার জন্য কি কোনো কাজ কর্‌তে পারব না?

কথাগুলো বলে ফেলে মাধবী চলে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় অশোক বই থেকে মুখ তুলে বল্লে—কে ডেকেছে তোমাকে? যা কর্‌ছিলে কর না গিয়ে—

অশোকের গলার স্বর ও বলবার ভঙ্গী শুনে মাধবী থম্‌কে দাঁড়াল। তারপর কিছুক্ষণ সেখানে চুপ কোরে দাঁড়িয়ে থেকে একেবারে ছাতে গিয়ে এক কোনে বসে কাঁদতে আরম্ভ করে দিলে।

মাধবী ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর অশোক একটা শব্দ কোরে জোরে বইখানা বন্ধ কোরে রেখে দিলে। সে ভাবতে লাগ্‌ল—এই আমার স্ত্রী! অসুখের সময় কাছে ডাক্‌লে পাওয়া যায় না। স্বামীর অসুখ, সে কেমন রইল একবার

জিজ্ঞাসা করবার অবসর পর্য্যন্ত তার নাই। এ তো হবেই, বড়লোকের মেয়ের কাছে এর চেয়ে আর বেশী কি আশা করা যায়! এই নিয়েই আমায় সারাজীবন কাটাতে হবে! এই সংসার—ধেৎ!!!

গভীর মর্ম্মবেদনায় একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে বালিশে হেলান নিয়ে চোখ বুঁজিয়ে ভাবতে লাগ্‌ল।

অরুণা চা নিয়ে ঘরের মধ্যে এসে অশোককে একলা ঐ রকমভাবে বসে থাকতে দেখে আশ্চর্য্য হোয়ে গেল। সে একটা টিপয়ে চায়ের কাপটা রেখে অশোককে জিজ্ঞাসা করলে—কি জপ এখনো শেষ হোলো না?

অশোক নিজের চিন্তায় এতদূর মগ্ন ছিল যে, অরুণার আসাটা সে মোটেই টের পায়-নি। তার গলার আওয়াজে অশোক চম্‌কে উঠে চোখ চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কি বল্‌লে?

অরুণা টিপয়খানা তুলে অশোকের সাম্‌নে নিয়ে গিয়ে রেখে জিজ্ঞাসা কর্‌লে—বল্‌চি, একলা বসে কেন?

অরুণার প্রশ্ন শুনে অশোক হাস্‌লে মাত্র।

অরুণা আবার বল্লে—হাস্‌লে যে?

অশোক বল্লে—আমার চিরটা কাল এই রকম একলাই কাট্‌ল, বুঝলে অরুণা। আর কটা দিন একলাই কাটিয়ে দেব।

অশোকের কথার মধ্যে একটা গভীর ব্যথা প্রচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু অরুণার কাছে তা চাপা রইল না। অশোকের জীবনের অনেক ব্যথা যে এই কয়টি কথার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে তার চেয়ে বেশী

আর কে সে কথা জানে! অরুণার একবার সন্দেহ হোলো—তবে কি অশোক মাধবীকে নিয়ে সুখী হয়-নি! কিন্তু মাধবীর মতন মেয়েকে নিয়ে যে সুখী হোতে না পারে তার চেয়ে দুর্ভাগা আর কে আছে? তবুও অরুণা অশোকের ওপর রাগ কর্‌তে পার্‌লে না। তার রাগ হোলো মাধবীর ওপরে। সে একটু এগিয়ে এসে সস্নেহে অশোককে জিজ্ঞাসা করলে—মাধবীকে তোমার কাছে যে পাঠিয়ে দিলুম, আসে-নি বুঝি?

অশোক চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বল্লে—এসেছিল একবাব ধর্ম্মের ডাক দিতে, চলে গেচে।

অরুণা অশোকের ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাড়ীময় মাধবীকে খুঁজে বেড়ালে কিন্তু কোথাও তাকে পেলে না। মাধবী নিশ্চয় ছাতে উঠেছে মনে কোরে সে সেদিকে যাচ্ছিল এমন সময় খোকার কান্নার আওয়াজ পেয়ে নীচে নেমে গেল।

মাধবী ছাতেব এক কোনে বসে খুব খানিকক্ষণ কাঁদ্‌লে। সে ভাবতে লাগ্‌ল—তার কি অপরাধ? স্বামী যে তার ওপর কেন এমন বিরক্ত হয়েছে কিছুতেই সে তার কোনো কারণ আবিষ্কার করতে পারলে না। ভাবতে-ভাবত মাধবীর মনে হোলো যে, স্বামী তাকে আর ভালবাসে না। তাকে ভালবাসে না তো কাকে ভালবাসে? নিশ্চয় অরুণাকে। তাকেই তো সে ভালবাস্‌ত, তার সঙ্গেই তো ওঁর বিয়ে হবার সব ঠিক ছিল, এ কথা তো অশোকই তাকে বলেছে।

মাধবীর চিন্তাস্রোত বেয়ে চল্‌ল! সে ভাবতে লাগ্‌ল—

স্বামীর ভালবাসা হারিয়ে কি কোরে সে বেঁচে থাকবে! আচ্ছা অরুণা কি—না না, ছি! এ কথা চিন্তা করাও পাপ। সে যে নিজের অস্তিত্ব মুছে ফেলে দিনরাত তাদের সেবাতেই কাটিয়ে দিচ্ছে! তবে! মাধবী ঠিক করলে তার অদৃষ্টই মন্দ! তা না হোলে বিনা দোষে স্বামী এমন বিরূপ হবে কেন? বুক ভরা ব্যথা নিয়ে সে ছাতে শুযে কাঁদতে আবন্ত কোবে দিলে।

রাত্রে অরুণাব শেষ কাজ ছিল মাধবীকে খাওয়ানো। সেদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে মাধবীকে যথাস্থানে দেখ্তে না পেয়ে অরুণা ডাক দিলে—মাধবী! কিন্তু তাব কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে সে একবার অশোকের ঘবে গিয়ে দেখলে যে সেখানে মাধবী আছে কি না। অরুণা দেখ্লে মাধবী সেখানে নাই, অশোক একলা ঘরে ঘুমুচ্ছে। সে সেখান থেকে উঠে ছাতে গিয়ে দেখ্লে মাধবী উপুড় হোয়ে হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে শুয়ে রয়েছে। অরুণা তার কাছে গিয়ে বল্লে—এ রকম কোরে শুয়ে আছিস্ যে?

মাধবী অরুণার আওয়াজ পেয়ে ধড়্মড়্ কোরে উঠে বস্ল, কিন্তু কিছু বল্লে না। অরুণা আবার বল্লে—এখানে এ রকম কোরে শুয়ে আছিস্ কেন? চল্ খাবি চল্।

মাধবী এবার ধরা-গলায় উত্তর দিলে—আমি খাব না।

মাধবী যে কি রকম অভিমানী মেয়ে অরুণা তা জান্ত। সে তার পাশে বসে বল্লে—আমি বকেছিলুম বলে রাগ হয়েছে?

অরুণার আদরের কথা শুনে অভিমানিণী মাধবী আবার কাঁদতে আরম্ভ করলে। মাধবীর কান্না দেখে অরুণা সত্যিই আশ্চর্য্য হোয়ে

গেল। মাধবী যে বড্ড অভিমানী সে কথা অরুণা জানত, কিন্তু অরুণার ওপরে সে কখনো রাগ করত না। তার সমস্ত অপরাধ ও বকুনি সে হেসে উড়িয়ে দিত। আজকে তার ওপরে মাধবীর এই দুর্জ্জয় অভিমান দেখে অরুণা একটু আশ্চর্য্য হোয়ে গেল। সে বল্লে—মাধবী আমায় মাপ কর্, আব যদি আমি তোকে কখনো কিছু বলেচি—

অরুণার কথা শেষ করতে না দিযে মাধবী তার মুখে হাত চাপা দিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে বল্লে—দিদি দিদি তোমার পায়ে পড়ি তুমি ও-কথা বোলো না—

মাধবী আর কিছু বল্‌তে পারলে না। সে অরুণার কোলের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলে।

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা অরুণার কাছে স্পষ্ট হোয়ে উঠ্‌ল। সে বল্লে—ও তাই বল্, ঝগড়া কোরে আসা হয়েছে!

মাধবী এবার মুখ তুলে ধরা গলায় বল্লে—দিদি আমি বড় দুঃখী।

অরুণা খানিকক্ষণ মাধবীর মুখের দিকে চেয়ে থেক্লে বল্লে—দেখ্ আর জ্বালাস্-নি। ওঠ্ বল্‌চি।

মাধবীকে তুলে খাইয়ে অরুণা তাকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজে এসে শুয়ে পড়্‌ল।

মাধবী শুতে এসে দেখ্‌লে যে, অশোক অঘোরে ঘুমুচ্ছে। সে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে স্বামীর মুখখানা ভালো কোরে দেখ্‌লে। এ মুখ তার পরিচিত, কিন্তু এমন কোরে একলা ঘুমন্ত স্বামীর

মুখের দিকে চেয়ে থাক্‌বার স্থযোগ তার কথনো হয়-নি। অশোকের মুখথানা দেখ্‌তে-দেখ্‌তে মাধবীর মনে হোলো বিয়ের পরে সে যে হাসিমাখা মুখ দেখেছিল সে মুখের এখন অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে। সমস্ত মুখখানায় যেন একটা বিষাদের আব্‌ছায়া ঘিরে রয়েছে। মাধবী ভাবতে লাগ্‌ল, স্বামীর এ বিষণ্ণতার কারণ কি? কিসের দুঃখ তার? আমি কি তাকে দুঃখ দিয়েছি? তার প্রতি সহানুভূতিতে মাধবীর চোখে জল এল। একবার তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরবার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছায় সে হাত দুখানা প্রসারিত করলে, কিন্তু তখুনি লজ্জায় সঙ্কোচে সে সরে দাঁড়াল।

মাধবী দূরে দাঁড়িয়ে নিজের মনের সঙ্গে তর্ক করতে লাগ্‌ল—এ লজ্জা তার কোথা থেকে এল, আগে হোলে সে এতক্ষণ নিশ্চয় স্বামীকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ কর্‌ত, কিন্তু আজ—হঠাৎ সে মনে প্রাণে অনুভব করলে স্বামীর কাছ থেকে সে অনেক দূরে সরে গিয়েছে।

মাধবী আর দাঁড়িয়ে থাক্‌তে পারলে না। সে আস্তে-আস্তে বিছানায় উঠে ঘুমন্ত স্বামীর পায়ে মাথা রেখে কাঁদ্‌তে আরম্ভ কোরে দিলে।

মনের আবেগ তার যতই প্রবল হোতে লাগ্‌ল সে অশোকের পা তত জোরে চাপ্‌তে আরম্ভ কোরে দিলে। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটবার পর অশোক ধড়মড় কোরে উঠে বস্‌ল। অশোক উঠ্‌তেই সে তার পা ছেড়ে দিয়ে অপরাধিনীর মত বিছানার এক পাশে সরে বস্‌ল। অশোক উঠে বল্লে—কে মাধবী?

মাধবী কিছু না বলে বিছানা ছেড়ে খাটের পাশে গিয়ে

দাঁড়াল। অশোক আর কিছু না বলে একটা যন্ত্রণাসূচক ওঃ—বলে আবার শুয়ে পড়্‌ল।

এবার মাধবী তার পাশে বসে জিজ্ঞাসা করলে—বড় কষ্ট হচ্ছে, মাথা টিপে দেব?

অশোক বল্লে—মাথায় একটা জলপটি লাগিয়ে দাও তো?

মাধবী অশোকের মাথায় জলপটী লাগিয়ে দিয়ে সারারাত তার মাথার শিয়রে বসে কাটিয়ে দিলে।

সকালে ঘর থেকে বেরিয়ে সে অরুণাকে বল্লে—দিদি, সইদের বাড়ীতে একটা খবর পাঠিয়ে দাও, আজ আর খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা হবে না।

অরুণা ব্যস্ত হোয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কেন রে! জ্বর বেড়েচে নাকি?

মাধবী বল্লে—না জ্বর কমে গেছে, কিন্তু আর আমার ভাল লাগ্‌চে না।

অগত্যা সেদিনের আনন্দ উৎসব বন্ধ কোরে দিতে হোলো। অরুণা মাধবীর সইয়ের বাড়ীতে খবর পাঠিয়ে তাকে বল্লে—তোমার সব তাতেই বাড়াবাড়ি! কর্ত্তাটীর এমন কিছু হয়-নি যার জন্য লোকজন নেমন্তন্ন কোরে আবার সে নেমন্তন্ন ফিরিয়ে নিতে হবে।

মাধবী অরুণার কথার কোনো জবাব না দিয়ে ছল্‌ছলে চোখ দুটো তুলে তার দিকে চেয়ে রইল মাত্র। কিন্তু অরুণা তার দিকে না চেয়েই অন্য কাজে চলে গেল। মাধবীর এই খামখেয়ালীর জন্য সেদিন অরুণা সত্যিই তার ওপর বিরক্ত হয়েছিল।

দিন কয়েক বিষম জ্বরে ভুগে অশোক সেরে উঠ্‌ল বটে, কিন্তু শরীর তার অত্যন্ত দুর্ব্বল হোয়ে পড়্‌ল। কিছুদিন থেকেই তার খাটুনী খুব বেড়েছিল। চিকিৎসকেরা তাকে মস্তিস্কের কোনো কাজ কর্‌তে বারণ কোরে কিছুদিন কোথাও ঘুরে আস্‌তে পরামর্শ দিলেন।

অশোক ঠিক কর্‌লে, সে দার্জ্জিলিংয়ে গিয়ে গরমের দুটো মাস কাটিয়ে আস্‌বে। সে একদিন মাধবীকে বল্লে—এই কটা দিন তুমি বাপের বাড়ীতে গিয়ে থাক না।

মাধবী যে বাপ মায়ের অত্যন্ত আদরের মেয়ে অশোক তা জান্‌ত। কিন্তু তার সঙ্গে ঝগড়া কোরে বাঁপের বাড়ী চলে যাওয়ার সেই ব্যাপারের পর থেকে মাধবী আর সেখানে যেতেই চাইত না। কখনো-কখনো অশোক খুব জিদ কর্‌লে সে সকালে গিয়ে সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরে আস্‌ত। অশোক মনে করেছিল যে, সে দু-মাস এখানে থাক্‌বে না এই সময়ে হয়তো মাধবীর সেখানে যেতে কোনো আপত্তি হবে না। সে ভালো ভেবেই প্রস্তাবটা করেছিল কিন্তু মাধবী তাকে ভুল বুঝ্‌লে। সে মনে কর্‌লে—পুরুষ কি স্বার্থপর! যতদিন নিজের দরকার ততদিন কাছে থাক। তার পরে তুমি যাও বাপের বাড়ী।

সে বল্লে—না সেখানে কেন যেতে যাব! আমি এখানেই থাকৃব।

একটু চুপ কোরে থেকে মাধবী অশোককে খোঁচা দিয়ে বল্লে—তুমি ফিরে এস, তারপরে যাব'খন।

অশোক তার দুর্ব্বল মস্তিস্কে ভেবে ঠিক কর্‌লে যে, তার অভাবে মাধবীর এখানে কোনো কষ্টই হবে না। সে সুখেই থাকৃবে। বরং সে কাছে থাকৃলেই তার কষ্ট, তা না হোলে সে ফিরে এলে বাপের বাড়ী যাবার কথা সে বল্‌তে পার্‌ত না। ভাবতে-ভাবতে তার ইচ্ছা হোলো এখুনি মাথায় কিছু একটা মেরে মরে যাই, আর মাধবী তাই দাঁড়িয়ে দেখুক। কিন্তু মনের সে প্রবৃত্তিকে কোনো রকমে দমন কোরে সে বল্লে—আর যদি না ফিরি? শরীরের যে রকম অবস্থা তাতে আর ফিব্‌ব বলে তো মনে হয় না।

অশোকের কথাগুলো মাধবীর বুকে ধারাল ছুরির মত লাগ্‌ল। তার মনে হোলো—রুগ্ন স্বামী, এই দুর্ব্বল শরীর নিয়ে কোন্ বিদেশে চলেচে। সেখানে কে তার সেবা কর্‌বে—যদি অসুখ হঠাৎ বেড়ে যায়—। মাধবী আর কিছু ভাবতে পার্‌লে না, আর কোনো কথা ভাববার তার সাহস হোলো না। সে ছুটে এসে অশোককে জড়িয়ে ধরে বল্লে—ওগো না না, তুমি যেও না, তুমি যেতে পাবে না। আমি তোমায় যেতে দেব না। মাধবী চীৎকার কোরে কেঁদে উঠ্‌ল।

অশোক আবেগে তাকে বুকের বুকের মধ্যে চেপে ধরে

ভাবতে লাগ্‌ল—যেতে দেব না—এ কথা এমন জোরে মাধবী ছাড়া আর তাকে কে বল্‌তে পারে! মাধবীর বিরুদ্ধে এতদিন ধরে তার মনের মধ্যে যত ময়লা জমেছিল তার অশ্রুজলে সে সব ধুয়ে মুছে গেল। সে আদর কোরে মাধবীর পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বল্লে—আরে আমি চালাকী করছিলুম।

মাধবী ঠোঁট ফুলিয়ে বল্লে—ও সব জানি না, আমি তোমার সঙ্গে যাব।

মাধবীকে কোনো রকমে নিরস্ত কোরে তখনকার মত কাজে পাঠিয়ে দিয়ে অশোক জিনিষপত্র গোছাতে লাগ্‌ল।

কিছুক্ষণ কাটবার পর অরুণা হঠাৎ ঘরের মধ্যে এসে অশোককে বল্লে—দেখ একখানা পূরো কম্পার্টমেণ্টে রিজার্ভ কোরে এস। আর আজ বিকেল বেলা আমাদের নিয়ে বাজারে বেরুতে হবে, খোকার জন্য কিছু গরম জামা কিন্‌ব।

বিস্মিত অশোক ট্রাঙ্ক থেকে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলে—ব্যাপাব কি?

অরুণা গম্ভীর ভাবে বল্লে—ব্যাপার এমন কিছুই, নয়; আমরা তোমায় একলা কোথাও ছেড়ে দেব না।

অশোক একটু হেসে বল্লে—চেলাটিকে কোথায় রেখে এলে?

—কোথায় আবার রেখে আস্‌ব!—বলে অরুণা দরজার দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে মাধবীকে ডাক দিলে—এই, এদিকে আয় না!

মাধবী ঘরের মধ্যে আস্‌তেই অশোক মুখ তুলে দেখ্‌লে যে, তার চোখের জল তখনো শুকোয়-নি। সে আবার মাথা

হেট্ কোরে ট্রাঙ্কের মধ্যে একটা গরম কোট ঠাস্‌তে-ঠাস্‌তে বল্লে—তোমরা তা হোলে নেহাৎই যাবে?

মাধবী ও অরুণা একসঙ্গে বলে উঠ্‌ল—নিশ্চয়!

অশোক জিজ্ঞাসা কর্‌লে—বেশ, কিন্তু খোকাকে কোথায় রেখে যাবে?

অরুণা জিজ্ঞাসা কর্‌লে—কেন?

অশোক এবার খুব গম্ভীর হোয়ে বল্লে—হিলু ডাইরিয়া বলে একরকম ব্যারাম আছে জান? ছোট ছেলে-পিলে সেখানে গেলেই সেই ব্যারামে ধরে।

অশোকের কথা শুনে অরুণা একেবারে চুপ হোয়ে গেল। তার মুখ দেখে মাধবীর মনে হোলো যে তার মামলা বুঝি এই খানেই ফেঁসে যায়। সে তাকে উৎসাহ দেবার জন্য বল্লে—তুমি শোনো কেন দিদি, সে দেশে আর ছেলে-পুলে নেই, লোকেরা একেবারে বুড়ো হোয়েই জন্মায়।

অশোক বল্লে—যা সত্যি তাই বল্লুম, শেষ কালে আমার দোষ দিও না।

অরুণা আরও কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে বল্লে—না বাপু, আমার ভালো লাগ্‌চে না। আমি খোকাকে নিয়ে এই খানেই থাকব, তোমরা যাও।

অরুণা চলে যাওয়ার পর মাধবী বল্লে—দেখ দিকিন, মিছি মিছি যা-তা বলে দিদির মন খারাপ কোরে দিলে!

অশোক বল্লে—বা রে! সত্যি কথা বল্লুম তাতে মন খারাপ হবে কেন!

মাধবী এবার একটু এগিয়ে এসে আস্তে-আস্তে অশোককে বল্লে—তা হোলে চল শুধু তুমি আর আমি যাই. আর কারুকে গিয়ে কাজ নেই।

মাধবীর প্রস্তাব শুনে অশোকের প্রলোভন হোলো। সে ভাব্‌লে, বেশ ছুটিতে থাক্‌ব, পাহাড়ে-পাহাড়ে বেড়াব। কিন্তু তখুনি তার মনে পড়্‌ল কালই সে হোটেলে একখানা সিট্‌ রিজার্ভ করবার জন্য টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। মাধবীকে নিয়ে যেতে হোলে আবাব তাদের লিখতে হবে। তার ওপরে হোটেলে থাকা তার কখনো অভ্যাস নেই, বাড়ীভাড়া কবলেও শুধু মাধবীকে নিয়ে যাওয়া চলে না। নানা-রকম ভাবনায় তার কল্পনার ফানুস তখুনি ফেঁসে গেল। সে মাধবীকে কাছে বসিয়ে সব কথা বুঝিয়ে বল্লে। কিন্তু কোনো যুক্তিই তার মগজে ঢুক্‌ছে না দেখে অশোক বল্লে—তা হোলে দিন কতক সবুর করা যাক, পূজোর সময় সবাই মিলে যাওয়া যাবে।

অশোকের মতলোব কিন্তু টিক্‌ল না। তাকে বুঝতেই হোলো যে, তাব শরীর ভয়ানক অসুস্থ এবং শীগ্‌গীর তাকে হাওয়া বদলাবার জন্য কোথাও যেতেই হবে। মাধবীও অশোকের সঙ্গে যাবার জন্য উৎসাহিত হয়েছিল কিন্তু অরুণার ধমুকে তার সে উৎসাহ ঠাণ্ডা হোয়ে গেল। অরুণা তাকে বুঝিয়ে দিলে যে, সে যাবার বায়না ধরলে অশোকের যাওয়া হবে না অথচ

অশোকের যাওয়া চাই-ই। এ ক্ষেত্রে অশোককে যেতে হোলো আর মাধবীকে থাকতে হোলো।

যোগমায়ার বয়স হয়েছিল এবং ইদানীং তাঁর শরীরও ভেঙে পড়েছিল। অশোক দার্জ্জিলিং যাবার কিছুদিন পর থেকে তাঁর একটু-একটু জ্বর হোতে লাগ্‌ল। কিন্তু সে জ্বরের কথা তিনি কারুকে বলতেন না, সামান্য শরীর খারাপ হয়েছে মনে কোরে চুপচাপ থাকতেন। তারই ওপরে নাওয়া-খাওয়া সবই চল্‌তে লাগ্‌ল।

অরুণার মার এক দূর সম্পর্কীয়া বোন ছিল। সে কলকাতায় আসার পর তিনি মাঝে-মাঝে অরুণাকে নিয়ে গিয়ে দু'চার দিন কাছে রাখতেন। এই সময় তাঁদের বাড়ীত কি একটা কাজ পড়ায় তিনি অরুণাকে দিন কয়েকের জন্য নিয়ে গিয়ে ছিলেন। অরুণা চলে যাওয়ায় সংসারের সমস্ত ভারই মাধবীর ওপরে পড়েছিল। শাশুড়ীর শরীর যে অসুস্থ সে দিকে সে তেমন লক্ষ্যই করে-নি!

কিছুদিন এই রকম অনিয়মের পর যোগমায়া শয্যাশায়ী হোয়ে পড়তেই মাধবী ব্যাকুল হোয়ে উঠ্‌ল। সে তাদের পারিবারিক চিকিৎসককে ডাকিয়ে শাশুড়ীর চিকিৎসা করাতে লাগ্‌ল। কিন্তু যোগমায়ার অসুখ সারবার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। তবে অসুখ যে শীগ্‌গীরই ভয়ানক আকার ধারণ করবে সে কথা সে স্বপ্নেও ভাবে-নি। পাছে অশোক চিন্তিত হোয়ে চলে আসে এই আশঙ্কায় সে স্বামীকেও কোন বিশেষ সংবাদ

পাঠায়-নি। এইভাবে দিন কাটছিল এমন সময় একদিন দুপুর বেলা মাধবীদের বাড়ীর সরকার এসে খবর দিলে—কর্ত্তার ভয়ানক ব্যামো, তিনি মেয়েকে দেখতে চেয়েছেন।

মাধবী শ্বাশুড়ীকে জিজ্ঞাসা করলে—মা কি করব ?

যোগমায়া বল্লেন—আজই যাও, আমিও যেতুম কিন্তু আমার শরীরের অবস্থা তাঁকে জানিও।

মাধবী বল্লে—তুমি একলা থাকবে—

যোগমায়া বল্লেন—একলা কি, দু-এক দিনের মধ্যেই তো অরুণা আসবে। না হয় তাকে নিয়ে আসব'খন।

পিতা মরণাপন্ন শুনে মাধবী অত্যন্ত বিচলিত হয়েছিল, কিন্তু শ্বাশুড়ীকে একলা অসুস্থ ফেলে চলে যেতে তার মন চাইছিল না। কিন্তু যোগমায়ার একান্ত আগ্রহে সেই দিনই সে পিত্রালয়ে চলে গেল।

যোগমায়া মনে করেছিলেন যে তিনি শীগ্‌গীরই সেরে উঠ্‌বেন, কিন্তু তা হোলো না। অনেক দিনের অনিয়মের ফলে রোগ একেবারে মজ্জাগত হোয়ে গিয়েছিল। তার ওপর রোগ বৃদ্ধির সময়ে বাড়ীতে কেউ না থাকায় তাঁর পথ্য ও সেবার গোলমাল হোতে লাগ্‌ল—ক্রমে রোগ সাংঘাতিক আকার ধারণ করলে।

অশোকের বাড়ীতে যে সরকার ছিল সে তাঁর অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করলে—গিন্নি মা, বাবুকে একটা খবর পাঠাই ?

তিনি বল্লে—না না, বাছা শরীর সারাতে গেছে তোমরা তাকে ব্যস্ত কোরো না। তুমি বরং অরুণাকে নিয়ে এস গিয়ে।

পরের দিন সরকার অরুণাকে তার মাসীর বাড়ীর থেকে নিয়ে এল।

অরুণা যোগমায়াকে সুস্থ দেখেই গিয়েছিল, ফিবে এসে তাঁর অবস্থা দেখে সে একেবারে চম্‌কে গেল। সে বল্লে—বড় মা তোমার এমন অসুখ আর আমায় খবর দাও নি?

যোগমায়া তাঁর সেই স্নিগ্ধ হাসি হেসে বল্লেন—এই তো আন্‌তে পাঠিয়েছি—আমাব কথা শুনেই তো তোকে নিয়ে এল।

অরুণা বড়মার চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছিল যে তাঁর অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। সে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা কোরে জানতে পারলে তার আশঙ্কা সত্য। সে সেই দিনই দার্জ্জিলিংয়ে অশোককে খবর পাঠাল।

মার অসুখের সংবাদ পাওয়া-মাত্র অশোক দার্জ্জিলিং থেকে চলে এল। মার অবস্থা দেখে সে পাগলের মত ডাক্তারের বাড়ী ছুটোছুটি আরম্ভ কোরে দিলে। কিন্তু কোনো চিকিৎসাতেই কিছু হোলো না, যোগমায়া নিশ্চিত মৃত্যুর পথে এগিয়ে চল্‌তে লাগ্‌লেন।

অরুণা সংসারের সমস্ত কাজ ফেলে দিনরাত যোগমায়ার সেবা করতে লাগ্‌ল। এই আপন-ভোলা মমতার দেবী তাকে কতখানি ভালবাসেন এবং তার দুর্ভাগ্যের জন্য নিজকে কত খানি দায়ী ও অপরাধী মনে করেন অরুণা তা জান্‌ত। সংসারে

সব-চেয়ে বড় বন্ধু যে ধীরে-ধীরে তার মায়া কাটিয়ে চলে যাচ্ছেন তা বুঝতে পেরে অরুণা একেবারে মুষড়ে পড়্‌ল।

সেদিন সন্ধ্যার সময় অশোক মার কাছে বসে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল এমন সময় তিনি বল্লেন—বৌমার কোনো চিঠি পেয়েচিস্—বেয়াই কেমন আছেন ?

অশোক বল্লে—না, কোনো চিঠি পাই-নি। ভাল আছেন বোধ হয়। কাল তাকে আসবার জন্য তার কোরে দেব!

যোগমায়া বল্লেন—অরুণা কোথায় ?

অশোক ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে ডাক্‌লে—অরুণা!

অরুণা বাইরেই বসে ছিল। সে ঘরে আস্‌তে যোগমায়া বল্লেন—অরুণা আমার কাছে বোস্।

অরুণা যোগমায়ার মাথার কাছে বসে তাঁর চুলের ভেতর দিয়ে আঙুল চালাতে লাগ্‌ল। কিছুক্ষণ চোখ বুঁজিয়ে থেকে তিনি বল্লেন—বাবা অশোক, আমি তো চল্লুম, যাবার সময় তোর কাছে আমার একটা ভিক্ষা আছে।

মার কথা শুনে অশোকের চোখে জল এল। ছেলেবেলা থেকে আরম্ভ কোরে আজকের এই মৃত্যুশয্যায় শায়িতা মাতার সমস্ত আদর ও স্নেহের কথা তার মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল। তার মনে হোলো তাদের সংসারে মা কেবল দুঃখই ভোগ কোরে গেলেন। তার সেই মা আজ তাকে সংসার-সমুদ্রে একলা ফেলে রেখে পরপারে চলেছেন। কেমন কোরে সে মাকে ছেড়ে দিন কাটাবে!

তারা মায়েতে ছেলেতে মিলে সেই ঝরে-পড়া বাড়ীতে কি দিনই কাটিয়েছে!

অশোক বল্লে—মা তুমি আমার কাছে ভিক্ষা চাইছ? তুমি কি জান না মা তোমাকে অদেয় আমার কিছু নেই।

যোগমায়ার দুই চক্ষু দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তিনি বল্লেন—জানি বাবা জানি, তুমি আমার বড় ভাল ছেলে। ভগবান তোমার ভাল করবেন।

যোগমায়া চুপ করতেই অরুণা বল্লে—বড় মা তোমার ওষুধ খাবার সময় হোলো, যাই ওষুধটা আনি গে!

যোগমায়া বল্লেন—অরুণা তুই একটু বোস্।

অরুণা আবার বস্‌বার পর যোগমাযা বল্লেন—বাবা অশোক, আমার কাছে তোর প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে, অরুণাকে তোরা কখনো ছাড়বি না—হাজার দোষ করলেও না।

কথাটা শুনে অরুণা চঞ্চলা হোয়ে উঠে পড়ছিল। কিন্তু যোগমায়া তখুনি তার হাত ধরে বসালেন। অশোক বল্লে—অরুণা কোথায় যাবে মা! ওকে কি আমরা ছাড়তে পারি?

যোগমায়া বল্লেন—অরুণা তোকেও প্রতিজ্ঞা করতে হবে মা। তুই অশোকদের ছেড়ে কোথাও যাবি না।

অরুণা কাঁদতে-কঁদেতে উত্তর দিলে—আমি এদের ছেড়ে কোথাও যাব না বড় মা, আমায় তাড়িয়ে দিলেও না। তোমার আদেশ আমি মৃত্যু পর্য্যন্ত পালন করব।

যোগমায়া বল্লেন—আর একটি কথা, অশোক তোর কাছে অপরাধী—তুই তাকে ক্ষমা কর্।

অরুণার রুদ্ধ আবেগ এবার আর বাধা মান্‌ল না। সে কাপড়ে মুখ ঢেকে কাঁদতে-কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

সেদিন রাত্রে খাবার সময় অশোক অরুণাকে বল্লে—অরুণা তুমি তা হোলে আমায় ক্ষমা কর্‌লে না? তা করবেই বা কেন, আমার অপরাধ যে গুরুতর।

অরুণা অশোকের কথা উড়িয়ে দিয়ে বল্লে—দেখ চালাকী কোরো না, খেতে বসেছ খাও। আর লুচি দেব?

অশোক এবার অন্য কথা পাড়্‌লে। সে বল্লে—মাধবীকে আসবার জন্য কালই তার কোরে দেওয়া যাক্, কি বল?

অরুণা বল্লে—হ্যাঁ তাকে আস্‌তে বল। এ সময়টা তার অন্যত্র থাকা ঠিক নয়। আর সেই ম্যালেরিয়ার দেশে খোকাকে নিয়ে সে এতদিন কি করচে তাও বুঝিনে। গিয়ে অবধি একখানা চিঠিও লিখ্‌লে না!

পরদিন অরুণা অশোককে খুব ভোরে বিছানা থেকে তুলে দিয়ে বল্লে—দেখ বড় মার অবস্থা খুব খারাপ বলে মনে হচ্ছে, এখুনি একবার ডাক্তারকে ডাকতে পাঠাও।

অশোক তখুনি মার ঘরে গিয়ে তাঁকে দেখ্‌লে যে তিনি শান্ত হোয়ে শুয়ে রয়েছেন। সে তখুনি ডাক্তারকে ডাক্‌তে পাঠালো। ডাক্তার এসে রুগী দেখে বল্লেন—ওষুধে আর কিছু হবে না! বোধ হয় দুই একদিনের মধ্যেই মারা যাবে।

অরুণা অশোককে বল্লে—মাধবীকে আস্‌বার জন্য এখুনি তার তারে দাও।

অশোক মাধবীকে টেলিগ্রাম কর্‌বার ব্যবস্থা কর্‌ছে এমন সময় হেমনগর থেকে তার শ্বশুরের মৃত্যু সংবাদ বহন কোরে এক টেলিগ্রাম এসে উপস্থিত হোলো।

অরুণা শুনে বল্লে—এ সময় আর তাকে আস্‌তে বলা ঠিক হবে না, যাক্‌ কয়েকটা দিন।

তিন চার দিন পরে একদিন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গে যোগমায়া ইহলোক থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। তাঁর মৃত্যুতে অশোকের চেয়ে অরুণাই বেশী কাঁদালে। তার মনে হোলো যোগমায়ার সঙ্গে সংসারে তার শেষ সম্বলটুকু নিঃশেষ হোয়ে গেল। এখন কেমন কোরে তার দিন কাট্‌বে।

অরুণাকে কিন্তু আবার উঠ্‌তে হোলো। আবার তাকে সংসারের কাজে মন দিতে হোলো। বাড়ীতে তখন সে ছাড়া আর কেউ নেই, অশোকের হবিষ্যি থেকে আরম্ভ কোরে সব বন্দোবস্তই তাকে কর্‌তে হোলো।

কয়েকদিন কাট্‌বার পর অশোক মাধবীকে চলে আসবার জন্য চিঠি লিখে দিলে। সে লিখ্‌লে, মার শ্রাদ্ধের সময় তুমি উপস্থিত না থাকলে বড় খারাপ দেখাবে। মাধবীকে অরুণাও লিখে দিল—মাধবী ভাই, শীগ্‌গীর চলে আয়, একলা আর দিন কাটে না।

পিতার মৃত্যুতে মাধবী অত্যন্ত অভিভূতা হোয়ে পড়েছিল।

সে ছিল বাবার আদুরে মেয়ে। তার মা তাকে মাঝে-মাঝে শাসন করতেন কিন্তু বাবাব বিরক্ত-মুখ পর্য্যন্ত সে কখনো দেখে-নি। তবুও শ্বাশুড়ীর মৃত্যুর কথা শুনেই সে চলে যেত কিন্তু মাকে নিয়ে বড় ব্যস্ত হোয়ে পড়্‌ল।

স্বামীর মৃত্যুর পর জমিদার-গিন্নি সেই যে শয্যা নিয়েছিলেন দু-দিন কেউ তাঁকে তুল্‌তে পাবে-নি। মাব অবস্থা দেখে মাধবী শক্ত হোয়ে মাকে গিযে তুল্লে, এবং এ কয়দিন সে ছাড়া আর কেউ তাঁকে নাওযাতে কিংবা খাওয়াতে পাবে-নি। এই সময় সে স্বামী ও অরুণার চিঠি পেল।

চিঠি পেয়ে মাধবীব উৎকণ্ঠা আরও বেড়ে গেল। সে বুঝলে যে শ্বাশুড়ীর শ্রাদ্ধের সময় তার না থাকাটা অত্যন্ত বিসদৃশ হবে। কিন্তু সে এও বুঝতে পারলে যে, এ সময়ে মাকে ফেলে চলে গেলে তাঁকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাতে তুলে দেওয়া হবে। স্বামীকে সে ভাল কোরেই চিন্‌ত। সে না গেলে অশোকের অভিমানটা কি গুরুতর হবে তা অনুমান কোবে তাব মনে হোলো—বাবার সঙ্গে আমারও কেন মরণ হোলো না!

সমস্ত দিন ভেবে মাধবী কিছুই ঠিক করতে না পেরে শেষকালে মাকে জানালে! মাধবীর যাবার কথা শুনে তিনি কেঁদে মেয়ের গলা জড়িয়ে ধরে বল্লেন—অভাগী মাকে ফেলে তুই কোথাও যাস্‌নে মাধবী। আমি অশোককে কালই লিখে দেব, সে আমার মনের কথা বুঝতে পারবে।

এই কথার পর মাকে ফেলে যাওয়া মাধবীর পক্ষে একেবারে

অসম্ভব হোয়ে দাঁড়াল। সে অশোককে কিছু না লিখে অরুণাকে একখানা চিঠি লিখ্‌লে—দিদি ভাই, বাবার মৃত্যুর পর মার অবস্থা অতি শোচনীয় হোয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি না হোলে তাঁর স্নান খাওয়া কিছুই হয় না। এ অবস্থায় মাকে ফেলে আমি কি কোরে যাব? উনি যে রকম অবুঝ তাতে বোধ হয় আমি না গেলে আমার ওপরে ভয়ানক রাগ করবেন। তুমি ভাই একটু বুঝিয়ে বোলো। আমি যা না পারব তুমি তা সহজেই পারবে, সেই জন্য তোমায় লিখ্‌চি। আমাব প্রণাম নাও। ইতি—

মাধবী

মাধবী অরুণার ওপর ভার দিযে নিশ্চিন্ত হোলো। সে ঠিক জান্‌ত যে, অরুণা ওকালতী কর্‌লে অশোক কথনো তার ওপরে রাগ কোরে থাকৃতে পার্‌বে না।

অরুণা সকাল বেলাতেই মাধবীর চিঠিখানা পেয়েছিল। যোগমায়ার শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে রোজ সন্ধ্যাবেলা অশোক ও অরুণার পরামর্শ চল্‌ত। অরুণা ঠিক কোরে রাখ্‌লে সেই সময় অশোকের মেজাজ বুঝে সে মাধবীর কথা তুল্‌বে। কিন্তু তার আগেই কি একটা কাজে অশোক অরুণার ঘরে এসে খামের ওপরে মাধবীর হাতের লেখা দেখে চিঠিখানা খুলে পড়ে রেখে দিলে। মার মৃত্যুতে একেই তার মন খারাপ কিন্তু একলা তার মোটেই ভাল লাগ্‌ছিল না। সে আশা কোরে বসে ছিল যে দুই একদিনের মধ্যে মাধবী চলে আস্‌বে। এমন সময় মাধবীর এই চিঠি পড়ে তার মেজাজটা ভারি খারাপ হোয়ে গেল। সে ভাবতে লাগ্‌ল—

মাধবী এ কথাগুলো আমায় জানালেই পারত। আমি অবুঝ! এতখানি ভালবাসার এই প্রতিদান? সে ভাবে সে ন্দ না পারবে অরুণা আমার কাছ থেকে অতি সহজেই তা আদায় করতে পারবে! তবে কি মাধবী সন্দেহ করে যে, অরুণাকে আমি এখনো ভালবাসি। মাধবীর ওপর রেগে সে মনে-মনে বলতে লাগল – ভালবাসিই তো। কেন অরুণাকে ভালবাসব না। তার গুণের কাছে মাধবী! সে মনে-মনে বলতে লাগল —অরুণা আমি তোমায় ভালবাসি—ভালবাসি—ভালবাসি—

হঠাৎ তার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে অরুণা ঘরের মধ্যে ঢুকে বল্লে—স্নান কোরে হবিষ্যি চড়িয়ে দেবে চল।

বালক কোনো নিষিদ্ধ কার্য্য গোপন করতে গিয়ে ধরা পড়লে যেমন কাঁচুমাচু হোয়ে পড়ে অরুণার এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে অশোকের অন্তরটাও ঠিক সেই রকম সঙ্কুচিত হোয়ে পড়ল। সে কোনো রকমে একটা যা-তা বলে তার সামনে থেকে সরে গিয়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা অশোক নেমন্তন্ন করতে বেরিয়েছিল বলে অরুণা তার কাছে মাধবীর কথা পাড়তে পারলে না। পরদিন সন্ধ্যার সময় একথা-সেকথার মধ্যে অরুণা তাকে বল্লে—দেখ মাধবীর মার শরীরের অবস্থা ভাল নয়। এ সময় কি তাকে নিয়ে আসা ঠিক হবে?

অশোক অত্যন্ত বিস্ময়ের ভান কোরে বল্লে—কেন! কি হয়েছে তাঁর?

মাধবী তার মার সম্বন্ধে যা লিখেছিল অরুণা তাব ওপরেও এক পোঁচ্ রং চড়িয়ে বল্লে—তিনি তো একেবারে শয্যাশায়ী, এবার বোধ হয় তাঁর পালা।

এবার অশোক একটু হেসে বল্লে—তুমি ভেবো না। তাঁর তেমন কিছুই হয়-নি। এই দেখ তিনি নিজের হাতে আমায় চিঠি লিখেছেন।

অশোক সেইদিন সকালেই শ্বাশুড়ীব চিঠি পেয়েছিল। সে চিঠিটা বের কোরে অরুণার হাতে দিলে। অরুণা চিঠিখানা পড়ে অশোকের হাতে ফিরিয়ে দিলে সে বল্লে—আমার কপাল, বুঝ্লে অরুণা! যাক্ কারুকে আস্তে হবে না। তুমি কি একলা গুছিয়ে উঠ্তে পাব্বে না?

অশোকের কথায় অরুণার বড় দুঃখ হোলো। সে তার মমতা-মাখান চোখ দুটি তুলে তার দিকে চেয়ে রইল, কিছু বল্লে না।

অশোক আবার বল্লে—এর পর তাকে আসবার জন্য পায়ে ধরে সাধতে পারি না তো!

অরুণা হেসে বল্লে—এমন কি হয়েছে যে পায়ে ধরে সাধ্তে হবে! সে না এলে কি কাজ হবে না?

অরুণা বল্লে—মাধবী তোমায় কিছু লেখে-নি?

অশোক বল্লে—না, দরকার বোধ করে-নি বোধ হয়।

অরুণা আর কোনো কথা না বল্লে অন্য কাজে চলে গেল।

মাধবীর হোয়ে ওকালতী কর্তে গিয়ে অরুণা অত্যন্ত অপ্রস্তত

হয়েছিল। মাধবীর চিঠি পড়ে তার সত্যিই মনে হয়েছিল যে, এ সময়ে মাকে ফেলে চলে আসা অত্যন্ত অন্যায় হবে। কিন্তু অশোকের কাছে তাঁর চিঠি দেখে তার মনে হোলো অন্ততঃ এই কয়েকটা দিনের জন্যও মাধবীর এখানে আসা উচিত ছিল। সমস্ত ব্যাপারটা অরুণার কাছে বড্ড বিশ্রী লাগ্‌তে লাগ্‌ল এবং অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও অশোকদের স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়ার মধ্যে নিজে জড়িয়ে পড়ছে বুঝ্‌তে পেরে অরুণা বিরক্তও কম হোলো না। তার মনে হোতে লাগ্‌ল যে, মাধবী যদি নিজে অশোককে সব কথা খুলে লিখ্‌ত তা হোলে এ সব ব্যাপারের মধ্যে তাকে থাক্‌তে হোতো না। অরুণা ঠিক কর্‌লে যা হবার হোয়ে গিয়েছে ভবিষ্যতে এই সব কথার মধ্যে সে একেবারেই থাক্‌বে না।

পরদিন সমস্ত ব্যাপারটা খুলে অরুণা মাধবীকে একখানা চিঠি লিখে দিলে। অশোক যে তার ওপর বিরক্ত হয়েছে তাও তাকে জানিয়ে লিখ্‌লে—পোড়ারমুখী আমায় অত কথা না লিখে যদি তাকে সব কথা খুলে লিখ্‌তিস্ তা হোলে এত গোলমাল হোতো না।

অরুণার চিঠি পেয়ে মাধবীর প্রথমটা ভারি লজ্জা হোলো। সে অরুণাকে লিখেছিল যে মাকে নিয়ে বিব্রত হোয়ে পড়েছে। কিন্তু তার মা যে অশোককে চিঠি লিখ্‌বেন বলেছিলেন সে কথা তার মনেই ছিল না। তার মনে হোলো অশোক ও অরুণা নিশ্চয় মনে কর্‌চে যে, এ সময় কলকাতায় যাবার তার ইচ্ছা নাই তাই যা-তা একটা ওজর জানিয়ে সে চিঠি লিখেছে। তারপর তার মনে হোলো অশোকের বিরক্তির কথা। অরুণার চিঠির সর্ব্বপ্রধান অংশই এইটুকু। চিঠি পড়ে মাধবীর দুঃখ হোলো;

তার মনে পড়্‌ল যে, কিছুদিন থেকেই তার স্বামীর ব্যবহার তার প্রতি কঠোর হয়েছে। অশোক যে তার প্রতি বিরক্ত হয়েছে সে সংবাদ অশোকের মুখ থেকে স্পষ্ট হোয়ে তার কাছে পৌছলেও অজ্ঞাতসারে তার ব্যবহার দিয়ে শতবার শত রকমে প্রকাশ হয়েছে। কেন যে স্বামী তার ওপরে এমন বিরক্ত হয়েছে সে কথা অনেকবার সে মনে-মনে আলোচনা করেছে, কিন্তু কোনো কারণ খুঁজে বার কর্‌তে পারে-নি, আজও পারলে না।

অরুণার চিঠি পাওয়ার পর সেদিন সমস্ত দিনটাই মাধবীর মন ভারী থাবাপ হোয়ে রইল। সমস্ত কর্ম্ম ও চিন্তার মধ্যে কেবল অশোকের বিরক্তির কথা তাকে খোঁচা দিতে লাগ্‌ল। সারারাত ধরে মনের শিলায় সে নিজের দুঃখকে শান দিয়ে-দিয়ে তীক্ষ্ণ কোরে তুল্লে। সে ঠিক কর্‌লে অরুণা আসবার আগে অশোক তার ওপরে এমন বিরক্ত হয়-নি, সে সময় তার সমস্ত দোষই অশোক ক্ষমা কর্‌ত। অরুণাকে চোখের সাম্‌নে দেখ্‌লে তাকে ভাল না বেসে থাক্‌তে পার্‌বে না এ কথা অশোক জান্‌ত বলেই বোধ হয় তাকে বাড়ীতে নিয়ে সে আস্‌তে চায়-নি। অরুণাকে তো সে-ই আনিয়েছিল। সে-ই তা হোলে নিজের সর্ব্বনাশ করেছে। কিন্তু অরুণা! তার সর্ব্বনাশ হচ্ছে, জেনেও সে কি স্বামীর এই ভালবাসায় প্রশ্রয় দেবে? কিংবা হয়ত অরুণা অশোককে ভালবাসে না। কিন্তু অরুণা তার স্বামীকে ভালবাসুক আর নাই বাসুক সে তার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বিয়ের পরে সেই সুখের দিনগুলোর কথা মনে কোরে মাধবী কাঁদতে লাগ্‌ল।

মাধবী ঠিক করলে যে, সে তার স্বামীকে পরদিন একখানা চিঠি লিখবে। চিঠিতে তার এতদিনের সঞ্চিত সমস্ত বেদনা ঢেলে দিয়ে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করবে যে, কি দোষে সে তার ওপর এমন বিরক্ত হয়েছে।

পরের দিন অশোককে চিঠি লিখতে বসে মাধবী অরুণার চিঠিখানা আর একবার পড়লে। কিন্তু আজ তার দুঃখ না হোয়ে অশোকের ওপর রাগই হোলো। তার মনে হোলো, যে বিরক্ত হওয়ার মতন এমন কি কাজ সে করেছে? এখনো এক মাস হয়-নি তার স্নেহময় পিতা মারা গেছেন এরি মধ্যে মাকে ফেলে শ্বশুরবাড়ী চলে যাওয়া হয়-নি বলে বিরক্ত! নিজের স্বার্থের একটুখানি নড়চড় হোলেই বিবক্ত! আমি অত কারুর বিরক্তের ধার ধারি না। কৈ, আমার বাবার অসুখ অথবা শ্রাদ্ধের সময় তিনি তো একবার এলেন না। তিনি বলবেন, তখন মার অসুখ। নিজের মাব অসুখ কি না তাই— আমার মার অসুখ—সেটা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়! ভাবতে-ভাবতে মাধবীর মন বিরক্তিতে বিষিয়ে উঠতে লাগল। সে কাগজ কলম তুলে অন্য কাজে চলে গেল।

অশোক শ্বাশুড়ীর চিঠির জবাব পাঠিয়ে দিলে কিন্তু তার মধ্যে মাধবীর কোনো উল্লেখ করলে না। মাধবীকে অরুণা কোনো চিঠি লিখলে কিনা তাও কিছু জিজ্ঞাসা করলে না।

অশোকের মার শ্রাদ্ধ নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হোয়ে গেল! মাধবীকে না দেখে অনেকে একটু আশ্চর্য্য বোধ করেছিলেন, কিন্তু বুদ্ধিমতী

অরুণা সে কথা আলোচিত হবার বেশী সুযোগ কারুকে দিলে না।

যোগমায়ার শ্রাদ্ধের কয়েকদিন আগে থেকেই অরুণার ভয়ানক খাটুনী পড়েছিল। অশোকের কাজকর্ম্মে সাহায্য করতে পারে এমন কোনো আত্মীয় ছিল না। পাড়ার দু-চার জন গিন্নি দয়া কোরে কোনো-কোনো কাজের ভার নিয়েছিলেন কিন্তু অরুণাকে সেই টাকার হিসাব থেকে আরম্ভ কোরে কাঙালী বিদায় পর্য্যন্ত সব দিকেই চোখ রাখ্‌তে হয়েছিল।

শ্রাদ্ধের শেষ দিনে নিমন্ত্রিত ও বাড়ীর চাকর-বাকরদের খাইয়ে অরুণা এসে নিজের ঘরের মেঝের ওপরে শুয়ে পড়্‌ল। বাড়ীতে আর কোনো গোলমাল সমারোহ নাই, কদিন হট্টগোলের পর আজ যেন সব ঝিমিয়ে পড়েছে। অবসাদগ্রস্ত শরীর নিয়ে সে মেঝেতে পড়ে এ-পাশ-ওপাশ কর্‌তে লাগ্‌ল।

শুয়ে-শুয়ে অরুণার মনে হচ্ছিল এতদিনে বড় মাকে সত্যিই হারালুম। তার মনে পড়্‌তে লাগ্‌ল—সেই ছোট্ট মেয়েটি যখন ছিলুম তখন থেকেই এই বাড়ীতে তার যাওয়া-আসা। তখন থেকে আরম্ভ কোরে ইহ-সংসারের শেষ দিনটি অবধি কেমন কোরে যোগমায়া তাঁর স্নেহের বর্ম্ম দিয়ে সংসারের কত কঠোর আক্রমণ থেকে তাকে রক্ষা করেছেন! স্বামীর সংসারে দারিদ্র্য-দুঃখ যখন তার দুর্ব্বিসহ হোয়ে উঠেছিল তখন তাকে রক্ষা করবার জন্য তিনি কি আকুল আবেগে কাশীতে ছুটে গিয়েছিলেন! কাশীর কথা মনে হোতেই অরুণার নিজের বিয়ের কথা মনে পড়্‌ল।

সে ভাবতে লাগ্‌ল কেমন কোরে তার জীবনটা এমন হোয়ে দাঁড়াল। যে বিধাতা তার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত কর্‌ছে একবার যদি তার সঙ্গে দেখা হয়—!

অরুণা ভাবতে লাগ্‌ল—অশোক কি সুখী হয়েছে! কৈ না। অমন সাধ্বী, সুন্দরী স্ত্রী পেয়েও সে তো সুখী হোতে পার্‌লে না। অতি দুঃখেও তার হাসি এল। তার মনে হোলো—কি কোরে সুখী হবে সে, ঈশ্বরের বিচার আছে তো! নিজের ভাগ্যের জন্য যে, ঈশ্বরকে সে মনে-মনে অভিসম্পাত দিচ্ছিল অশোকের ভাগ্যের জন্য সে, ঈশ্বরের সূক্ষ্ম বিচারের প্রশংসা না কোরে থাকতে পার্‌লে না। কিন্তু অরুণার চিন্তাস্রোতে তখনি বিপরীত তরঙ্গ খেল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। তার মনে হোলো অশোক যদি কিছু অন্যায় কোরে থাকে তবে সে তার ওপরেই করেছে। তার জীবন তো বিফলে কেটে গেলই—হে ঈশ্বর অশোককে তুমি সুখী কর!

অরুণা আবার ভাবতে লাগ্‌ল—অশোকের সঙ্গে তার বিয়ে হোলে অশোক কি সুখী হোতো—না না, যা হয়-নি, যা হবার নয় সে কথা ভেবে লাভ কি! সে জোর কোরে এই ভাবনাগুলো তার মন থেকে দূর কোরে দিতে চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল। কিন্তু অশোকের চিন্তা যেন তার মনের মধ্যে জোট খেয়ে গিয়েছিল কিছুতেই তাকে সে ছাড়াতে পার্‌ছিল না। অরুণার চোখের কোনে একবিন্দু অশ্রু দেখা দিল, তারপরে আর এক বিন্দু—সে উপুড় হোয়ে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে লাগ্‌ল।

মার শ্রাদ্ধ শেষ কোরে অশোক নিজের ঘরে গিয়ে একটা ইজি-চেয়ারে লম্বা হোয়ে শুয়ে পড়্‌ল। মাধবী যে তাকে চিঠি লেখে-নি, সে যে ছল কোরে মার শ্রাদ্ধে এল না এবং অশোক যে তাকে আর আস্‌তে লেখে-নি, শ্রাদ্ধের গোলমালের মধ্যেও এই কথাগুলো সর্ব্বদাই তার মনের মধ্যে খোঁচা দিয়েছে। সমস্ত গোলমাল মিটে যাওয়ার পর অন্ধকার নির্জ্জন ঘরটির মধ্যে বসে অশোক মনের মধ্যে এই কথাগুলো নিয়ে তোলপাড়া করছিল এমন সময় হঠাৎ তার অরুণার কথা মনে পড়্‌ল। এই ক'দিন তারা দুজনে সন্ধ্যার সময় বসে শ্রাদ্ধের কথা নিয়ে আলোচনা করেছে—অশোকের মনে হোলো, আজ আর পরামর্শ করবার কোনো প্রয়োজন নাই, অরুণাও তাই আসে-নি।

অরুণার কথা ভাবতে-ভাবতে তার মনে হোলো যে, সে-ও তার কাছে বিনা প্রয়োজনে আস্‌তে চায় না। এতদিন দরকার ছিল তাই কর্ত্তব্যের খাতিরে সে আস্‌ত, কিন্তু আজ কর্ত্তব্য সাঙ্গ কোরে অরুণা ছুটি নিয়েছে। নিরালা বসে-বসে তার মনে হোতে লাগ্‌ল—এ সংসারে কেউ তার সাহচর্য্যেও সুখ পায় না। এ তার অদৃষ্টের লিখন! তা না হোলে তার অমন মা তিনি তাকে ছেড়ে কাশী চলে গিয়েছিলেন কেন! তার সংসার ছোট্ট, আত্মীয় স্বজনও তার বেশী নাই—তবুও সবাইকে জড়িয়ে নিয়ে এক সঙ্গে সুখে থাক্‌বার চেষ্টা সে যতবারই করেছে ততবারই তার চেষ্টা বিফল হয়েছে। এ পৃথিবীতে তাকে নির্ব্বান্ধব হোয়ে থাক্‌তেই হবে, এই বিধিলিপি! বিদ্যা, অর্থ, যশ, সুন্দরী স্ত্রী—মানুষ যা

কামনা করে, যা পেলে মানুষ সুখী হয় তার সবই তো সে পেয়েছে, কিন্তু কোনো জিনিষই তো সুখ দিতে পার্‌লে না। অশোকের মনে হোতে লাগ্‌ল, তরে মত অসুখী জীব পৃথিবীতে আর নাই। সে মনে-মনে স্থির করলে, আর কোনো সুখ আহরণ করবার চেষ্টা সে করবে না।

অশোকের মনে হোলো এই কদিন অরুণা যে রকম শৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ চালিয়েছে তার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। অবিশ্যি কৃতজ্ঞতা লাভের আশায় অরুণা কাজ করে-নি, তবু— তবু—এ তার কর্ত্তব্য।

অশোক চেয়ার ছেড়ে ঘরের বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে এল। নিস্তব্ধ বাড়ী, ঝি-চাকরেরা এই কদিনের খাটুনীর পর আজ তাড়াতাড়ি খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। কেউ কোথাও নাই, অশোক ধীরে-ধীরে অরুণার ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

অরুণার ঘরের দরজা খোলা ছিল কিন্তু অন্ধকার বলে ভেতরকার কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। অশোক একটু দাঁড়িয়ে, ঘরের মধ্যে ঢুকে বল্লে—অরুণা কি ঘুমিয়েছ?

অরুণার কোনো সাড়া শব্দ না পেয়ে অশোক খাটের কাছে গিয়ে দেখ্‌লে বিছানায় কেউ নাই। তারপরে সে মুখ ফিরিয়ে দেখ্‌তে পেলে অরুণা মেজের ওপরে হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে পড়ে রয়েছে। অশোক আর একবার ডাক্‌লে—অরুণা!

অশোক এবারও কোনো সাড়া না পেয়ে ঘুরে গিয়ে অরুণার শিয়রে বসে পড়্‌ল। কিছুক্ষণ সেখানে বসেই সে বুঝতে পার্‌লে

যে, অরুণা এতক্ষণ কাঁদছিল, সে আসার পর কান্না চাপবার চেষ্টা করছে। অশোক অরুণার মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—কাঁদ্চ কেন অরুণা?

অশোক প্রথমে যখন অরুণাকে ডাক দেয় তখন অরুণা মনে করেছিল যে, সে বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে। তার দেহ ও মন এমন একটা অবসাদে এলিয়ে পড়েছিল যে, অশোকের আহ্বানে সাড়া দিতে কিছুতেই তারা রাজী হোলো না। সে ভাবলে এই ভাবে তার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালে নিশ্চয় অশোক তাকে কাঁদবার কারণ জিজ্ঞাসা কর্‌বে। তার চেয়ে তুই একবার ডেকে সাড়া না পেলেই ঘুমিয়ে পড়েছে মনে কোরে সে চলে যাবে।

অশোকের সহানুভূতি মাখান হাতখানা অরুণার মাথা স্পর্শ কববামাত্র তার মনে হোতে লাগ্‌ল যেন তার সমস্ত শরীর একেবারে হিম হোয়ে যাচ্ছে। একবার সে ভাবলে যে হাতখানা ছুঁড়ে সরিয়ে দিই কিন্তু তখুনি তার মনে হোলো—কেন? এ আদর পাবার কি অধিকার আমার নাই। সে কায়মনবাক্যে কামনা করতে লাগ্‌ল—একটা প্রাকৃতিক বিপ্লবে বিধাতার এই বিশ্বচূর্ণ হোয়ে যাক্, আর এই মুহূর্ত্তটুকু অনন্তকালে পরিণত হোক্। ধরার বুকে আমি আমি আর অশোক—অশোক আর আমি অনন্তকাল বেঁচে থাকি। কিন্তু অরুণার আজন্মসঞ্চিত সংস্কাব তখুনি ভেতর থেকে গর্জ্জন কোরে উঠে বল্লে—নরক—অনন্ত নরক—। সংস্কারের তাড়নায় সে একবার ওঠবার চেষ্টা করলে কিন্তু প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা কোরেও সে উঠ্‌তে পার্‌লে না।

এই স্পর্শকে অবহেলা করবার শক্তি তার হোলো না। সে ভাবতে লাগল স্বেচ্ছায় যা এসেছে কেন আমি তা হেলায় হারাই। কাল অশোক এমন কোরে আমার মাথায় আদরে হাত বুলিয়ে দেবে না। আজকের কথা মনে হোলে হয়ত কাল সে লজ্জা পাবে। আমার? আমার এতে কোনো লজ্জা নাই। এই আদব তো আমার প্রাপ্য। কোন পাপে আমি এই স্বর্গ থেকে বঞ্চিত হয়েছি!

নানারকম ভাবনায় অরুণার হৃদয় মথত হোতে লাগ্‌ল, সে সেই অবস্থায় পড়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে সুরু কোরে দিলে।

অশোক অরুণার মাথায় হাত বুলোচ্ছিল, হঠাৎ তার কান্নার বেগ বেড়ে গেল দেখে সে একটু সরে গিয়ে তার মাথাটা নিজের কোলের ওপর টেনে নিলে। তার মনে পড়ছিল অরুণার পিতার মৃত্যু দিনে সে সেই রুদ্ধমানা বালিকাকে এই রকম আদর কোরে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিল। পিতার মৃত্যুতে তার যে কি সর্ব্বনাশ হোলো সে কথা বোঝবার মত বয়স অরুণার তখনো হয়-নি। মার কান্না দেখে সে কেঁদেছিল মাত্র। সেদিন অশোকের চোখেও জল এসেছিল, সে দুঃখ অরুণার পিতার মৃত্যুর জন্য নয়, অরুণার কান্না দেখে তারও কান্না পেয়েছিল। বাল্য সঙ্গিনীকে কাঁদতে দেখে সেই কিশোর বয়সে অশোক মনে-মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল অরুণাকে সে কখনো দুঃখ দেবে না। অশোক ভাবতে লাগ্‌ল—আজ আমি সেই রুদ্ধমানা অরুণাকে কি বলে সান্ত্বনা দেব। আমিই যে তাকে চরম দুঃখ দিয়েছি।

অরুণা অশোকের কোল থেকে মাথা তুলে নেবার কোনো

চেষ্টাই করলে না। অশোক যেমন ভাবে তার মাথাটা নিজের কোলে তুলে নিয়েছিল ঠিক তেমনি ভাবেই পড়ে সে কাঁদতে লাগ্‌ল।

অরুণা যে কেন কাঁদছিল তা সে নিজেই বুঝতে পারছিল না। তার বুকের মধ্যে একটা ব্যথা বার-বার গুমরে উঠ্‌ছিল আর তার জীবনব্যাপী ব্যর্থতার ফাটল দিয়ে সে ব্যথা অশ্রুর প্রবাহরূপে ঝরে পড়ছিল। অনেকক্ষণ প্রাণপণে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ কোরে শেষে সে কান্না থামিয়ে ফেল্লে কিন্তু তার শরীর ও মন দারুণ অবসন্নতায় আছন্ন হোয়ে পড়্‌ল। তার মনে হোতে লাগ্‌ল যেন তার দেহ বলে কোনো পদার্থ নাই শুধু তার মনটা পঙ্গু হোয়ে অশোকের কোলের ওপরে পড়ে রয়েছে।

অরুণার মাথা কোলে তুলে নিয়েই অশোকের মনে হয়েছিল এখুনি সে উঠে বস্‌বে। কিন্তু কান্না থেমে যাওয়ার পরেও সে নড়্‌বার কোনো চেষ্টা না করায় অশোক আশ্চর্য্য হোয়ে গেল। অরুণার হঠাৎ আজ কি হয়েছে তা সে কিছুতেই ভেবে ঠিক করতে পারছিল না।

অশোকের চিন্তাস্রোত বিচিত্র তরঙ্গ-ভঙ্গীতে বয়ে চল্‌তে লাগ্‌ল। অরুণার মাথা কোলে নিয়ে সে ভাবতে লাগ্‌ল—অরুণা কি আমায় এখনো ভালবাসে! সে-ও কি তবে আমার মতন অন্তরে-অন্তরে দগ্ধ হচ্ছে? প্রেম স্বর্গচ্যুত আমি, আমার মত অভাগা জগতে আরো ক'জন আছে? আমি কি অরুণাকে ভালবাসি? হ্যাঁ—নিজের সঙ্গে ছল কোরে লাভ কি? আমি

অরুণাকে ভালবাসি। তবে কি আমি মাধবীকে ভালবাসি না? আজ যদি অদৃষ্ট মাধবী ও অরুণা দুজনকে আমার সম্মুখে নিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করে—কাকে চাও তুমি? দুজনকে একসঙ্গে পাবে না। অরুণাকে যদি চাও তবে এই নাও তাকে। সে তোমার বাল্যের সঙ্গিনী, তোমারই বাগ্দত্তা। প্রেমে, যত্নে, সেবায়, সাহায্যে সে তোমার আদর্শ সঙ্গিনী হবে কিন্তু মাধবীকে তা হোলে ভুল্‌তে হবে। আর যদি মাধবীকে চাও, এই নাও। মাধবীকে তুমি জান, পৃথিবীর সমস্ত সুখ যখন তোমার কাছে নীরস হোয়ে উঠেছিল, তখন অযাচিতভাবে মাধবী তার প্রেমের অমৃতধারায় তোমার অন্তরকে সজীব কোরে তুলেছিল। এই সেই মাধবী, এর দ্বারা তুমি অসুখী হবে না। কিন্তু মনে রেখো অরুণাকে তা হোলে পাবে না। দুঃখিনী অরুণার ইহজীবন এই ভাবেই কাটবে। নাও, বেছে নাও!

অশোকের বিবাহিত জীবনের প্রতিদিনের কাহিনীগুলো তার মানসপটে ফুটে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। তার অন্তরাত্মা চীৎকার কোরে উঠ্‌ল—না না, মাধবীকে আমি ছাড়্‌তে পারব না। সে আমার ওপর যতই অবিচার করুক—

ঠিক সেই মুহূর্ত্তে অশোকের চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে অরুণা ধড়্‌মড়্‌ কোরে উঠে বস্‌ল। ত্রস্তভাবে শিথিল বস্ত্রাঞ্চল গায়ে জড়িয়ে নিয়ে সে অশোককে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার খাওয়া হয়েছে?

অরুণার গলার স্বরে তখনো কান্নার রেশ জড়িয়েছিল। তার প্রশ্ন শুনে অশোক বল্লে—না, আর খাব না।

অরুণা দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে—কেন! শরীর খারাপ লাগ্‌চে?

অশোক বসে-বসেই বল্লে—না খেতে ইচ্ছা করচে না।

অরুণা খপ্‌ কোরে অশোকের একখানা হাত ধরে বল্লে—দেখ, না খেলে আমি মনে করব তুমি আমার ওপর রাগ করেছ।

অশোক বল্লে——তুমি কেন কাঁদছিলে তা না বল্লে আমি কিছুতেই খাব না।

অশোকের কথা শুনে অরুণার চোখে আবার জল এল। সে করুণ মিনতির সুরে বল্লে—তোমার পায়ে পড়ি আমায় সে কথা জিজ্ঞাসা কোরো না—

অরুণা আর কিছু বল্‌তে পার্‌লে না। সে সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগ্‌ল।

কিছুক্ষণ এইভাবে কেটে গেল, তারপর অশোক উঠে বল্লে—চল অরুণা খেতে দেবে।

অশোকের ক্ষিদে ছিল না, সমস্ত দিন খাবার ঘাঁটাঘাঁটি কোরে খাবার স্পৃহা তার চলে গিয়েছিল কিন্তু তবুও অরুণার মনটাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য সে খেতে বসে গেল। খাওয়া শেষ কোরে অশোক বল্লে—অরুণা, এবার তুমি খেতে বোসো।

অরুণা সেই থেকে এতক্ষণ অত্যন্ত গম্ভীরভাবে অশোককে পরিবেশন করছিল। অশ্রু না থাকলেও তার চোখ ও মুখ থেকে বিষণ্ণতার আব্‌ছায়া একেবারে মুছে যায়-নি। অশোকের কথা

শুনে মেঘমগন আকাশে সহসা সুধাংশু-বিকাশের মত তার মুখে এক ঝলক হাসি ফুটে উঠ্‌ল।

অশোক বল্লে—হাসলে চল্‌বে না, তুমি খেতে বোসো আমি পরিবেশন করি।

অরুণা আবার ঠিক সেই রকম হাসি হেসে বল্লে—দূর্‌,—আজ যে একাদশী—

অশোকের মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত যেন একটা অগ্নিময় শলাকা বিদ্যুৎবেগে বেরিয়ে চলে গেল। অরুণাকে কিছু একটা বলবার জন্য সে দুই একবার প্রাণপণে চেষ্টা করলে কিন্তু কোনো কথা তার মুখ দিয়ে বেরুল না। সে আস্তে-আস্তে সেখান থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

মাধবী ভেবেছিল অশোক তাকে ফিরে যাবার জন্য আবার চিঠি লিখবে। সে জান্‌ত যে তাকে ছেড়ে অশোক থাকতে পারবে না, চিঠি তাকে লিখতেই হবে। কিন্তু অশোক যে তার ওপর অত্যন্ত অবিচার করেছে এই অভিমান সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না। সে রোজই কাগজ কালি নিয়ে অশোককে চিঠি লিখতে বস্‌ত কিন্তু রোজই অশ্রু এসে তার ধৈর্য্যকে ভাসিয়ে নিয়ে যেত, লেখা আর হোয়ে উঠ্‌ত না।

এম্‌নিভাবে প্রায় চার মাস কেটে গেল কিন্তু অশোকের কাছ থেকে একখানা চিঠিও মাধবীর কাছে এল না কিংবা মাধবীও অশোককে চিঠি লিখলে না।

অনেকদিন আগে মাধবী যখন রাগ কোরে বাপের বাড়ী চলে এসেছিল, সেবার মিলনের সময় অশোক মাধবীকে বলেছিল যে তার অভাবে অশোকের দিনগুলো বড় দুঃখেই কেটেছে। মাধবীর কানে অশোকের সেই কথাগুলো দিনরাত গুঞ্জন করতে থাকে, আর সে ভাবে তাকে ছেড়ে অশোকের দিন এখন কেমন কাট্‌চে! অশোক কি তার অভাব আর অনুভব করে না! তার মনে হয়, এখন আর তার অভাবে অশোকের কষ্ট হবে

কেন? এখন যে অরুণা কাছে আছে। মাধবী ভাবে সেখানে অশোক ও অরুণা ছাড়া আর তৃতীয় ব্যক্তি নাই। ছি ছি—তাদের কি চক্ষু লজ্জাও ঘুচে গেছে! সে ছেলেকে বুকে চেপে ধরে কাঁদতে থাকে

মাধবীকে ছেড়ে অশোকের কষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে মাধবী স্বেচ্ছায় না এলে সে তাকে আসবার জন্য লিখবে না। কিন্তু দিন যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে তার দৃঢ়তা ও প্রতিজ্ঞার মূল শিথিল হোয়ে আসতে লাগ্‌ল। এদিকে অরুণাও রোজ মাধবীকে আসতে চিঠি লেখবার জন্য অশোককে তাগাদা দিতে লাগ্‌ল।

একদিন অরুণা অশোককে বল্লে—মাধবী যদি না আসে তবে খোকাকে পাঠিয়ে দিতে লিখে দাও। ছেলে তার নয়, ছেলেকে সে আমায় দিয়ে দিয়েছে।

অশোক অরুণাকে কথা দিলে যে কাল নিশ্চয় সে মাধবীকে চিঠি লিখ্‌বে। কিন্তু অশোক চিঠি লেখবার আগেই সে মাধবীর কাছ থেকে একখানা চিঠি পেল। মাধবী লিখেছে।—

শ্রীচরণেষু

আমার প্রণাম জান্‌বে। আশা করি তুমি ভালই আছ। মার শ্রাদ্ধের সময় ইচ্ছা সত্ত্বেও আমি যেতে পারি-নি। সে সময় মার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা এত খারাপ ছিল যে তাঁকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও ছেড়ে যাওয়া আমার পক্ষে অত্যন্ত অন্যায় হোতো। কথাটা বোধ হয় তোমার বিশ্বাস হবে না,

কিন্তু বিশ্বাস না হোলে কি করব—যা সত্য কথা তাই লিখ্‌ছি। শুনলুম, আমি না যাওয়ায় তুমি আমার ওপর খুব রাগ করেছ। শুধু শোনা কেন, তোমার ব্যবহারেও বুঝতে পারছি। কিছুদিন থেকে—কয়েক বছর থেকেই দেখ্‌চি তুমি আমারি ওপরে অকারণে বা অতি সামান্য কারণেই বিরক্ত হও। আমার অনেক দোষ আছে জানি, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য এই যে, এই দোষগুলো তোমার চোখে আজকাল যেমন ভাবে ধরা পড়ে আগে তা পড়্‌ত না।

আমি যে কেন তোমার চক্ষুশূল হয়েছি তার কারনও আমি জানি। আমি জানি যে তুমি আমায় ভালবাস না। তুমি যে কাকে ভালবাস সে কথাও আমি জানি, আরও জানি যে সে-ও তোমায় ভালবাসে। তোমরা দুজনে সুখী হও, তোমাদের সুখে বাধা দিতে আমি যাব না। তোমারি কাছে থেকে অবহেলা ও অবজ্ঞা সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব হবে। এখানে থাকলে তবুও তা থেকে নিস্তার পাব। ইতি—

মাধবী

মাধবীর চিঠি পড়ে অশোকের প্রথমে হাসি পেল। তার পরে সে ভাবতে লাগ্‌ল—এ চিঠির তাৎপর্য্য কি? অরুণাকে সে ভালবাসে এ কথা নিজের মনে সহস্রবার স্বীকার করলেও মাধবী সে কথা জানতে পেরেছে এই লজ্জায় সে যেন মরে যেতে লাগ্‌ল। মাধবীর চিঠির কোনো উত্তর দেবে কি না

অশোক সেই কথা ভাবচে এমন সময় অরুণা তাকে কি বল্‌তে এসে তার হাতে চিঠি দেখে বল্লে—কার চিঠি?

অশোক একটু হাসবার চেষ্টা কোরে বল্লে—মাধবীর।

—কি বলে?

—এই দেখ—বলে অশোক চিঠিখানা অরুণার হাতে দিলে।

অরুণা চিঠি পড়ে সেখানা অশোকের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বল্লে—সরকার মশায় দিন কয়েকের জন্য ছুটি চাইচেন, কি বল্‌ব?

মাধবীর চিঠি পড়ে অরুণা কি বলে তা শোনবার জন্য অশোক উদগ্রীব হয়েছিল কিন্তু সেই অভিযোগগুলোকে অরুণা কোনো রকম আমলই দিলে না দেখে সে আশ্চর্য্য হোয়ে গেল। সে অরুণার প্রশ্নের কোনো জবাবই দিতে পারলে না।

অরুণা আবার জিজ্ঞাসা করলে—কি বল?

এবার অশোক বল্লে—ও সব ব্যাপারের মধ্যে আমাকে জড়িও না, অরুণা। ও হোম ডিপার্টমেণ্টের কাজ—তুমি ভাল জান।

অরুণা চলে যাচ্ছিল, অশোক তাকে ডেকে বল্লে—মাধবীকে কি লিখ্‌ব?

অরুণা বল্লে—তা আমি কি জানি। ও তোমার ডিপার্টমেণ্ট তুমি জান।

মাধবীর চিঠি তাকে কোন রকম বিচলিত করতে পারলে-নি এইটে দেখাবার জন্য অরুণা অশোকের সামনে হাসতে-হাসতে ঘর

থেকে বেরিয়ে গেল বটে, কিন্তু মাধবীর ইঙ্গিত যে তারই দিকে আঙুল তুলে রয়েছে সে কথা বুঝতে পেরে সে লজ্জায় মরে যেতে লাগ্‌ল। অরুণাও ভাবতে লাগ্‌ল অশোককে যে সে ভালবাসে সে কথা তো কখনো সে মাধবীর কাছে প্রকাশ করে-নি। মাধবী কত দিন কত ছলে ও কৌশলে তার অন্তরের মনিকোঠা থেকে এই গুপ্ত কথাটি বের করবার চেষ্টা করেছে। মাধবীর আদরে সোহাগে, যত্ন রহস্যে অভিভূতা হোয়ে কতদিন তার মনে হয়েছে, বলি—ওরে তোর স্বামীকে আমি ভালবাসি এখনো ভালবাসি, কিন্তু আমার ভালবাসা তোর সুখের কখনো কণ্টক হবে না, তোর জন্য আমি অবহেলায় প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি।

অরুণা চলে যাওয়ার পর অশোক মাধবীর চিঠিখানা হাতে কোরে বসে রইল। তার একবার মনে হোলো যে, অরুণাকে মাধবীর চিঠিখানা দেখান ভাল হয়নি। কিন্তু যা হোয়ে গিয়েছে তার আর উপায় নাই। তার মন বলতে লাগ্‌ল— মাধবী আমায় মুক্তি দিয়েছে। কেন সে আমায় এখন মুক্তি দিলে! আমি তার কাছে কী অপরাধ করেছি!

ঘরের মধ্যে বসে-বসে বারোটা বেজে গেল তবুও অশোক সেখান থেকে বাইরে বেরুতে পারলে না। তার খালি মনে হচ্ছিল বাইরে বেরুলেই অরুণার সঙ্গে দেখা হোয়ে যাবে। অরুণা নিশ্চয় মনে করেছে যে মাধবীর সঙ্গে তার কলহের মধ্যে সে তাকেও নিজের দলে টানতে চায়, তার হাসি-হাসি মুখ আর

সন্দেহমিশ্রিত জলভরা চোখ দুটো নিয়ে যখন সে তার মুখের দিকে চাইবে ! মাধবী কেন তাকে এ বিপদে ফেল্লে ।

মাধবীর অভিযোগ সাপের মতন অরুণার সমস্ত চিন্তাকে সাপ্‌টে জড়িয়ে রইল । সে অসহ্য মানসিক যন্ত্রণায় শেষে নিজের ঘরের মধ্যে গিয়ে কাঁদতে আরম্ভ কোরে দিলে । অরুণার মনে হতে লাগ্‌ল অশোকের প্রতি তার যে ভালবাসা সে কথা মাধবী যদি জানতে পেরেই থাকে তবুও সে অশোককে তা খুলে লিখ্‌লে কেন । এ অপরাধের জন্য মাধবীকে সে কিছুতেই ক্ষমা করবে না—কিছুতেই না ।

অশোক বসে-বসে ভাবছিল—কি করা যায় ! অন্য দিন এগারোটা বাজতে না বাজতে অরুণা তাকে স্নান করবার তাড়া দেয় কিন্তু আজ বারোটা বেজে গেল তবু অরুণার দেখা নেই । অরুণা যে কেন তাকে তাড়া দিতে আস্‌চে না অশোক তা বুঝতে পেরেছিল আর সেই কারণেই সে-ও অরুণার সামনে বেরুতে পারছিল না । শেষকালে সে কাগজ কলম নিয়ে মাধবীকে চিঠি লিখতে বস্‌ল । অশোক লিখ্‌লে—

মাধবী—

তোমার চিঠি পেলুম । চিঠিতে আমার প্রতি তুমি যে অভিযোগ করেছ সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে চাই না । আমার যদি পতন হয় তার জন্য কি তুমি কিছুমাত্র দায়ী হবে না ? হোতে পারে আমি তোমার স্বামী হবার উপযুক্ত নই, কিন্তু তোমার সঙ্গে যখন আমার বিয়ে হয়েছে তখন আমায় উপযুক্ত কোরে নেবার

চেষ্টা করা তোমার উচিত নয় কি? কিন্তু এ সব কথা লেখা বৃথা, কারণ তুমি যখন আর আমার কাছে আসবেই না, তখন ভবিতব্য যা আছে তা হবেই। তুমি পত্র পাঠ মাত্র খোকাকে পাঠিয়ে দেবে। কারণ, ছেলে তুমি নিজেই অরুণাকে দিয়ে দিগেছ, তার ওপরে তোমার কোনো দাবী নেই। আশা করি নিজের কথা অবহেলা করবে না।—ইতি—অশোক

মাধবীকে চিঠি লিখে অশোকের মন অনেক পরিমাণে হাল্কা হোয়ে গেল। সে ঠিক করলে—যাক্ এবার আবার এক নতুন পথে যাত্রা! মনের মধ্যে অন্য কোনো চিন্তা আসবার অবসর না দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে ডাক দিলে—অরুণা!

অরুণা তার ঘরে ছিল, সে সাড়া দিতেই অশোক বল্লে—আমি নাইতে যাচ্ছি, খাবার দিতে বল।

অশোক মনে করেছিল মাধবীর চিঠি পড়ে অরুণা নিশ্চয় তাকে অন্যত্র কোথাও রেখে আসতে বল্‌বে। সেখানে মনে এও স্থির কোরে ফেলেছিল যে, অরুণা চলে যেতে চাইলে সে আপত্তি করবে না। কিন্তু অরুণা মাধবীকেও নিয়ে আসতে বল্লে না অথবা নিজেও কোথাও যেতে চাইলে না। কিন্তু অশোক লক্ষ্য করলে যে, হাস্যমুখী অরুণা প্রায়ই গম্ভীর হোযে থাকে। মাঝে মাঝে তার এই গাম্ভীর্য্যকে সে হাসি দিযে ঢেকে ফেলবার চেষ্টা করে বটে কিন্তু তাতে হাসির চেয়ে হাসবার চেষ্টাটাই বেশী কোরে ফুটে ওঠে।

অরুণা আগে প্রায়ই অশোককে বল্‌ত—মাধবী না আসে তো ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিতে লিখো, একলা আর থাকতে পারিনে।

কিন্তু সেদিন থেকে ছেলের তাগাদাও সে বন্ধ কোরে দিয়েছিল।

অশোক মাধবীকে ছেলে পাঠিয়ে দিতে লিখেছিল কিন্তু প্রায় একমাস চলে গেল ছেলে অথবা মাধবী কেউ এল না দেখে একদিন সে অরুণাকে বল্লে—মাধবী তো খোকাকে পাঠালে না। শেষকালে দেখ্‌চি জোর কোরে ছেলে নিয়ে আন্‌তে হবে।

অরুণা বল্লে—সে কি রকম ?

অশোক বল্লে—ছেলের জন্যে আদালতে দরখাস্ত কোরে দিই।

কথাটা ঠাট্টা কোরে বল্লেও অশোক এমন গম্ভীর ভঙ্গিতে বলেছিল যে তা শুনে অরুণা অবাক হোয়ে গেল। বিস্ময়ে তার মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ কোনো কথা বেরুল না। তার ঠোঁটের ডগায় অত্যন্ত একটা রূঢ় কথা এসেছিল, অনেক কষ্টে সে কথা চেপে সে বল্লে—আক্কেল বলে জিনিষটা কি তোমার কোনো কালেই হবে না! কি বলে তুমি এ কথা বল্লে বল তো!

অরুণাকে রাগতে দেখে অশোক হেসে ফেলে বল্লে—আমার আক্কেল ঠিক আছে, কিন্তু খেটে-খেটে তোমার আক্কেলটা একদম গিয়েছে দেখ্‌চি। ঠাট্টা বুঝতে পার না?

অশোকের কথা শুনে অরুণা লজ্জিতা হোলো। সত্যিই তো এ কথা রহস্য ছাড়া আর কি হোতে পারে? কিন্তু তবুও সে হার মান্‌লে না। সে বল্লে—কি জানি, তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর যে ব্যাপার দেখ্‌চি তাতে আর কিছুই অসম্ভব বলে মনে হয় না।

অশোক অরুণার এ কথায় আর কোনো জবাব দিতে পারলে না। সে হার মেনে অন্যত্র চলে গেল।

সেদিন অশোকের অন্য কোনো কাজ ছিল না। দুপুর বেলাটা নিজের ঘরে বসেই কাটিয়ে দিলে।

অরুণার রহস্যের মধ্যে যে হুল ছিল তারই জ্বালায় সে কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিল না সে বসে-বসে ভাবছিল, তবে কি মাধবীর সঙ্গে এ জীবনের মত সমস্ত সম্বন্ধ শেষ হোয়ে গেল? যদি তাই হয়! মাধবী যদি সত্যিই তাই চায় তবে আর উপায় কি? সংসারে

এমন দৃষ্টান্ত তো বিরল নয়! অন্তরের ব্যথায় অশোকের চোখের কোনে জল দেখা দিল। সে ভাবতে লাগ্‌ল, যাকে তার বিয়ে কোরে সংসারী হবার কথা কেমন কোরে সে তার জীবন-পথ থেকে সরে গেল। সংসার পারাবার উত্তাল তরঙ্গাঘাতে একদিন যাকে তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল আজ আবার নিষ্ঠুর পরিহাসচ্ছলে তার প্রাণহীন দেহখানা কূলে ফিরিয়ে দিয়ে গিয়েছে। অরুণাকে সে কি আর পেতে পারে না! অশোক তার কল্পনাকে মুক্ত কোরে দিয়ে দেখলে সে কি পরামর্শ দেয়। কিন্তু আশৈশব পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত অরুণার সঙ্গে মিলন সম্বন্ধে তার কল্পনা-পাখী সামাজিক সংস্কারের বেড়ার গায়ে বার কয়েক পাখার ঝাপট্‌ মেরে স্তব্ধ হোয়ে রইল। না তা হয় না——।

অশোক আবার ভাবতে লাগ্‌ল, মাধবী তাকে এ দুঃখ দিল কেন? এ রকম জীবন মাধবীর কেমন লাগ্‌চে। এতদিন তার সঙ্গে ঘর করলুম তবুও তাকে চিনতে পারলুম না। আচ্ছা স্বীকার করলুম যে আমারই অপরাধ হয়েছে কিন্তু স্ত্রীর কি স্বামীর অপরাধ অবহেলা করা উচিত নয়! ভাবতে-ভাবতে অশোকের মন অবসাদে ভরে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

সমস্ত দুপুর ও বিকেলের খানিকটা ঘরের মধ্যে বসে কাটিয়ে অশোক বেরিয়ে পড়্‌ল। ঘরের বাইরে বারান্দায় অরুণা বসেছিল, অশোক তাকে বল্লে—চল অরুণা, গাড়ী কোরে কোথাও বেড়িয়ে আসি।

অরুণা বল্লে—আজ থাক অন্য দিন যাওয়া যাবে।

অশোক দেখলে অরুণার মুখ অস্বাভাবিক রকমের গম্ভীর, তার চোখের কোন ফুলো। সে জিজ্ঞাসা করলে—তোমার কি অসুখ করেছে ?

অরুণা ছোট্ট একটি উত্তর দিলে—না।

অশোক আর কোনো কথা না বলে বেরিয়ে গেল। অরুণার আকস্মিক এই ভাবপরিবর্ত্তনের কোনো কারণ সে ভেবে ঠিক করতে পারলে না।

অরুণার সেই সংক্ষিপ্ত দুটি উত্তরের মধ্যে সে সহস্র রকমের অর্থ আবিষ্কার করতে লাগ্‌ল কিন্তু কোনোটাই তার সমীচীন্ বোধ হচ্ছিল না। অনেক চিন্তার পর সে মনকে বুঝিয়ে দিলে—যাক্ যা হবার হয়েছে—আমি জ্ঞানতঃ তার কাছে কোনো অপরাধই করি-নি।

সে দিন অশোকের বাড়ী ফিরতে অন্যদিনের চেয়ে রাত্রি হোয়ে গেল। রাত্রি বেলা অরুণা এসে ডাকলে সে খেতে যেত; অশোক নিজের ঘরে বসে অরুণার জন্য অপেক্ষা করতে লাগ্‌ল। কিন্তু খাবার সময় কেটে যাবার পর অনেকক্ষণ অপেক্ষা কোরে অশোক রান্না ঘরে গিয়ে দেখ্‌লে যে সেখানে অরুণা নাই, পাচক হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে নিদ্রা দিচ্ছে। অশোক ঠাকুরকে কোনো কথা জিজ্ঞাসা না কোরে একলা খেয়ে নিজের ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়্‌ল।

সমস্ত দিন চিন্তা সাগরে সাঁতার দিয়ে অশোকের মন ক্লান্ত

হোয়ে পড়েছিল বটে কিন্তু অনেক চেষ্টা কোরেও কিছুতেই সেই ঘুম আনতে পারলে না। ঘণ্টা দুয়েক বিছানায় ছট্‌ফট্‌ কোরে সে উঠে ঘব থেকে বেরিয়ে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সে দিন আকাশে ছোট্ট একটু চাঁদ হাসছিল। যেন ছোট্ট একখানা হীরের নৌকো নীল পারাবারের বুকের ওপর দিয়ে অনন্তের পথে ছুটে চলেছে। চারিদিকে উঁচু নীচু ছোট বড় বাড়ী, তারই মাঝে মাঝে দু একটা নারকোল গাছ আকাশের দিকে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এই স্তব্ধ সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটু শান্তির জন্য অশোক অনেকক্ষণ স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

অনেকক্ষণ সেই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার পর একবার সে দেখলে তারই কিছু দূরে অরুণা দাঁড়িয়ে একমনে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। অশোক তাকে দেখে কোনো কথা না বলে আবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। আরও কিছুক্ষণ সেই ভাবে কেটে যাওয়ার পর অশোক সরে এসে অরুণাকে জিজ্ঞাসা করলে কি ভাব্‌চ অরুণা?

অরুণা যেন অশোকের এই প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা করছিল। সে বল্লে—এই ভাব্‌চি যে, এ জীবনে মানুষের যত সাধ অপূর্ণ থেকে যায়, পরলোকে কি পরজন্মে কি তা পূরণ হয়? ইহজীবনের মত যাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হোয়ে যায় মৃত্যুর পর কি কোথাও আবার তাদের সঙ্গে দেখা হবে?—এই সব কথা ভাব্‌চি—।

অশোক অরুণার কথা শুনে একবার 'ও' বলে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল। হঠাৎ একটা ঝট্‌কা বাতাস কোথা থেকে ছুটে এসে প্রকৃতির নিস্তব্ধতার মধ্যে একটু চাঞ্চল্য

জাগিয়ে দিয়ে চলে গেল। অশোক ভাবলে এবার ঘরের মধ্যে গিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করা যাক—এমন সময় অরুণা ধীরে-ধীরে তার কাছে এসে বল্লে—আচ্ছা, তুমি কিছু জান তো বল না? তুমি তো অনেক পড়েছ—।

অশোক একটু ভেবে বল্লে—তোমার প্রশ্নের ঠিক উত্তর কেউ দিতে পারবে না অরুণা। মানুষ চিরদিন এই রহস্যের পিছনে ঘুরে মরছে কিন্তু সে রহস্যের আবরণ আজও কেউ খুলতে পারে-নি। তবে আমার মনে হয় মানুষের সুখ-দুঃখ শান্তি-অশান্তি সব এই জীবনের সঙ্গেই শেষ হোয়ে যায়। মৃত্যুই সব শেষ, তার পরে আর কোনো জীবন আছে বলে আমার বিশ্বাস হয় না।

কথা শেষ কোরেই অশোক অরুণার দিকে চেয়ে দেখলে তার মুখখানা অস্বাভবিক রকমের ফ্যাকাশে হোয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি বল্লে—অরুণা নিশ্চয় তোমার কিছু অসুখ করেছে—

অরুণা অসহিষ্ণুভাবে হাত নেড়ে অশোকের কথা থামিয়ে দিলে। তারি পরে অতি কষ্টে একবার ঢোক গিলে অশোকের একখানা হাত চেপে ধরে বল্লে—তবে?

অশোক বুঝতে পারলে যে, অরুণার হাতখানা থর্‌থর্ কোরে কাঁপছে। সে স্নিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করলে—তবে কি অরুণা?

অরুণা বল্লে—এই যদি তোমার বিশ্বাস, তবে তুমি কেন অন্যকে দুঃখ দাও। দুঃখ—নিদারুণ দুঃখ। মৃত্যুর পরেও যে দুঃখের—

অরুণা অশোকের দুই হাত ধরে কাঁদতে লাগ্‌ল ।

অশোক কিছুক্ষণ কোনো কথা বল্‌তে পারলে না। তার পরে সে ধীরে-ধীরে বল্‌তে লাগ্‌ল—আমায ক্ষমা কর অরুণা। আমি তোমায় দুঃখ দিয়েচি—নিদারুণ দুঃখ। কিন্তু তুমি কি জান না অরুণা যে, তুমি সুখে থাক্‌বে এই আশাতেই আমি সে দুঃখ দিয়েছিলুম। তোমায় সে দুঃখ দিতে আমি যে কি দুঃখ পেয়েচি—যাক্ সে কথা আর তুল্‌ব না। তুমি আমায় ক্ষমা কর অরুণা—

অরুণা অশোকের হাত দুটো হঠাৎ জোরে ছুঁড়ে দিয়ে বল্লে—না না তোমায় কখনো ক্ষমা কর্‌ব না। আমার অভিসম্পাতে মৃত্যুর দিন পর্য্যন্ত তুমি শান্তি পাবে না

অরুণা সেখান থেকে টল্‌তে-টল্‌তে গিয়ে রেলিংয়ে মাথা রেখে কাঁদতে লাগ্‌ল। অশোক বিমূঢ়ের মত সেইখানে স্থির হোয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখ দিয়ে একটা সান্ত্বনার কথাও বেরুল না।

অরুণা কিছুক্ষণ সেই ভাবে থেকে ছুটে এসে অশোকের পায়ের কাছে আছ্‌ড়ে পড়্‌ল। অশোক তাকে তোলবার জন্য তাড়াতাড়ি হাত নীচু করলে কিন্তু অরুণা দু-হাত দিয়ে অশোকের দু-পা জড়িয়ে ধরে বলতে লাগ্‌ল—তুমি আমায় ক্ষমা কর। আমি যা বলেছি সব মিথ্যা—মিথ্যা। তোমার জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে পারি—আমায় পরীক্ষা কর—।

অশোক প্রগাঢ় স্নেহে অরুণাকে তুলে বল্লে—জানি অরুণা!

তুমি যে কত দুঃখে আমায় রূঢ় কথা বলেছ তা কি আমি জানি না! তারই অনুশোচনায় আমি নিশিদিন দগ্ধ হচ্ছে। সেই জন্য তোমার কাছে কতবার ক্ষমা চেয়েছি। আমি নিঃসঙ্কোচে তোমার কাছে স্বীকার করছি যে, আমি তোমায় ভালবাসি। কিন্তু—

অরুণা তার অশ্রুপূর্ণ দুই চোখ নিয়ে অশোকের মুখের দিকে চেয়ে বিহ্বল স্বরে বল্লে—যদি ভালবাস, তবে আমায় একটি ভিক্ষা দাও—

অশোক বল্লে—অরুণা তোমাকে অদেয় আমার কিছু নাই। কিন্তু তার আগে বল তুমি আমায় ক্ষমা করেছ।

অরুণা বল্লে—ক্ষমা তোমায় আমি একটি সর্ত্তে করতে পারি। সেইটি আমায় ভিক্ষা দাও।

—কি সে সর্ত্ত বল অরুণা, তোমার ক্ষমার জন্য আমি যে কোনো সর্ত্তে রাজি আছি।

অরুণা একটু চুপ কোরে বল্লে—মাধবীকে তুমি দুঃখ দিও না। তুমি তাকে বড় দুঃখ দিচ্ছ।

অরুণার অনুরোধ শুনে অশোক আশ্চর্য্য হোয়ে গেল। সে বল্লে—আমি তো—

অরুণা আবার তাকে থামিয়ে দিয়ে বল্লে—কোনো যুক্তি তর্ক শুনতে চাই না। তার যত অপরাধই থাকুক না কেন, বল তুমি তাকে দুঃখ দেবে না। তবেই আমি তোমায় ক্ষমা করব—নচেৎ নয়।

অশোক বল্লে—কি আমায় করতে হবে বল?—

তুমি তাকে গিয়ে নিয়ে এস। সে অভিমান কোরে বসে আছে, কিন্তু সে যে কি কষ্টে আছে তা আমি জানি।

অশোক বল্লে—বেশ !

তারপর একটু হেসে বল্লে—কিন্তু সে তোমায় কি বলেছে তা পড়েছ তো ?

—আমায় সে যা বলেছে তার বোঝাপড়া আমার সঙ্গে হবে। বল কবে তাকে আনতে যাবে ?

—আস্‌চে শনিবার।

—আচ্ছা যাও, এখন শোও গিয়ে

এই কথা বলে অরুণা তখুনি নিজের ঘরে ঢুকে দরজায় খিল লাগিয়ে দিলে।

পরদিন অশোক অরুণাকে বল্লে—তুমি তো মাধবীকে নিয়ে আসতে বল্লে, কিন্তু সে যদি না আসে।

অরুণা বল্লে—মুখটি চূণ কোরে ফিরে আসতে হবে।

অশোক বল্‌তে লাগ্‌ল—তারা বড়লোক। যদি আমায় মার-ধর দিয়ে অপমান কোরে তাড়িয়ে দেয় ?

এবার অরুণা হাসতে-হাসতে বল্লে—তা হোলে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এস।

অশোক বল্লে—তার চেয়ে চল না আমরা দুজনেই যাই, তুমি বল্লে মাধবী আর না বল্‌তে পার্‌বে না।

অশোকের প্রস্তাবটা অরুণার মন্দ লাগ্‌ল না। সে একটু ভেবে বল্লে—বেশ, তাই চল। মাধবীদের বাড়ীটা দেখে আসি।

সেদিন ছিল শুক্রবার। অশোক ও অরুণা ঠিক করলে পরদিন সকালের ট্রেনে তারা হেমনগরে যাবে।

দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া শেষ কোরে অরুণা একটা ছোট্ট বাক্সের মধ্যে খানকয়েক কাপড় ভরে নিচ্ছিল এমন সময় বাইরে থেকে ডাক এল—দিদি!

বাক্স ফেলে অরুণা তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলে মাধবী ছেলের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। অরুণা টপ্ কোরে খোকাকে তুলে বুকের মধ্যে চেপে ধরে মাধবীকে বল্লে—আজ কার মুখ দেখেছি যে এমন বরাত হোলো?

মাধবী অরুণাকে প্রণাম কোরে দাঁড়াল। অরুণার আর জ্ঞান ছিল না। এতদিন পরে খোকাকে পেয়ে তাকে চুমু খেতে খেতে ঘরের মধ্যে নিয়ে গিয়ে এক জায়গায় বসে পড়্ল। খোকাও বহুদিন পরে বড় মাকে পেয়ে সব ভুলে গিয়েছিল। সহস্র রকমের প্রশ্নে সে অরুণাকে ব্যস্ত কোরে তুল্তে লাগ্ল। হঠাৎ অরুণা লক্ষ্য করল্লে যে, মাধবী বাইরেই দাঁড়িয়ে আছে। সে ঘরে বসেই ডাক দিলে—মাধবী আয়্।

মাধবী আস্তে-আস্তে ঘরে এসে অরুণার কাছে বসে বল্লে—দিদি, তোমার কাছে আমি বড় অপরাধ করেছি, আমায় ক্ষমা কর।

অরুণা হাসতে-হাসতে বল্লে—কি অপরাধ রে?

মাধবী বল্লে—সে কথা আমি তোমায় বল্তে পার্ব না, তোমায় তা না জেনেই ক্ষমা করতে হবে।

মাধবীর কথা শুনে অরুণা গম্ভীর হোয়ে গেল। কিন্তু সে মুহূর্তের

জন্ত। তখুনি সে আবার হেসে বল্লে—আমার কাছে তোর কোনো অপরাধই অপরাধ নয়—মাধবী আমার দুঃখু এই যে, তুইও আমায় এতদিনে চিন্‌লি-নে।

মাধবী আর কোনো উত্তর দিতে পারলে না। লজ্জায় সে লাল হোয়ে উঠতে লাগ্‌ল, তারপরে অরুণার চোখে একবার তার চোখ পড়তেই সে তার কোলের পিছে মুখ লুকিয়ে ফেল্লে।

অরুণা বল্লে—পোড়ারমুখী থাকতে পারলি না তো?

মাধবী মুখ তুলে বল্লে—আমি আজই সন্ধ্যেবেলায় চলে যাব দিদি। আমি এসেছি তোমার কাছে ছেলেকে ভিক্ষে নিতে। ছেলে ছেড়ে আমি যে থাকতে পারব না দিদি।

অরুণা কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বল্লে—ছেলে আমি কিছুতেই দেব না। এম্‌নিতে না দিলে আমায় নালিশ করতে হবে।

মাধবী কিছু বুঝতে না পেরে অরুণার মুখের দিকে অবাক হোয়ে চেয়ে রইল।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা অশোক বাড়ীতে ফিরে দেখলে যে ভেতর বাড়ীর উঠোনে একটা বাঁশ পুঁতে ঘোড়াটাকে বাঁধা হয়েছে, আর অরুণা সেখানে দাঁড়িয়ে সহিসকে ধমক দিচ্ছে।

অশোক বল্লে—ব্যাপার কি?

অরুণা বল্লে—মোটর কিনে অবধি আর ঘোড়াটার কোনো খোঁজই তো রাখ না। দেখ দিকিন্ খেতে না দিয়ে ও কি হাল করেছে। আজ থেকে আমার সামনে ওকে খেতে দিতে হবে, তাই বলে দিলুম।

সহিস চলে যাওয়ার পর অশোক একটু হেসে বল্লে—অরুণা কাল থেকে চোগা চাপকান পরে তুমি আমার সঙ্গে কাছারীতে বেরুতে আরম্ভ কর। আমার কাজের যা সুবিধা হবে তাতে—

অরুণা বল্লে—আমায় চাপকান পরাবার আগে নিজের খান কয়েক চাপকান করিয়ে নাও। তোমার মতন ছেঁড়া চাপকান-ওয়ালা উকীলের কাছে মক্কেল আসে কি কোরে?

অশোক আর বাক্য ব্যয় না কোরে সেখান থেকে সরে গেল। কাছারীর কাপড় ছেড়ে সে ইজি-চেয়ারখানা টেনে নিয়ে এসে বারান্দায় লম্বা হবার আশায় শোবার ঘরে গিয়ে ঢুক্‌ল। অন্ধকার ঘর, বিজলী বাতির সুইচ টিপ্‌তেই তার পেছন দিকে কে যেন ধড়্‌ফড়্‌ কোরে উঠ্‌ল। অশোক পেছন ফিরে দেখলে মাধবী মেজের ওপরে বসে আছে। বিস্মিত অশোকের মুখ দিয়ে কোনো কথা বেরুল না, সে একদৃষ্টে দাঁড়িয়ে মাধবীকে দেখতে লাগ্‌ল।

ঘরের মধ্যে হঠাৎ আলো ও সেই সঙ্গে অশোককে দেখে মাধবী যে কি করবে তা ঠিক করতে পারলে না। কিছুক্ষণ স্থির হোয়ে বসে থেকে সে উঠে পড়্‌ল। মাধবী দাঁড়াতেই তার কোল থেকে একটা ছোট্ট হাতীর দাঁতের বাক্স ঝনাৎ কোরে মাটিতে লুটিয়ে পড়্‌ল। ফুলশয্যার রাত্রে অশোক মাধবীকে এই বাক্সটা উপহার দিয়েছিল। বিয়ের পর যে দেড় বছর মাধবী বাপের বাড়ীতে ছিল, সেই সময় অশোক তাকে যত চিঠি লিখেছিল অতি যত্নে মাধবী সেগুলোকে এই বাক্সের মধ্যে রেখে দিয়েছিল।

বিরহীর দীর্ঘশ্বাস ও আসন্নমিলনসুখের কল্পনায় সে চিঠির প্রতি ছত্র বিচিত্র রঙে রঙিল।

অত্যন্ত দাহ্যমান তরল পদার্থে একটি আগুনের ফুল্‌কি পড়্‌লে যা হয় অশোকের মনের অবস্থা সেই মুহূর্ত্তে সেই রকম অগ্নিময় হোয়ে উঠ্‌ল। সে ছুটে গিয়ে মাধবীকে জড়িয়ে ধর্‌লে—মাধবী মাধবী—আমার মাধবী—।

মাধবী কি বল্‌তে যাচ্ছিল কিন্তু অশোক চুম্বনে-চুম্বনে তার কথার দুয়ার বন্ধ কোরে তাকে খাটের ওপর নিয়ে বসালে। তার পরে দীর্ঘ বিরহের বোঝা পড়া!—হাসি, অশ্রু, মান, অভিমান—।

হঠাৎ অরুণার কণ্ঠস্বরে তাদের চমক ভাঙ্‌ল। অরুণা বাইরে দাঁড়িয়ে বল্‌ছিল—খেয়ে-দেয়ে নিশ্চিন্ত হোয়ে সারারাত্রি ধরে মান অভিমানের পালা গেও। এখন ওঠ দিকিন্—

সম্পূর্ণ